প্রকাশক

সুশীলকুমার সিংহ

নতুন সাহিত্য ভবন

৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট

কলিকাতা-২০

মুদ্রাকর

সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

তাপসী প্রেস

৩০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

গ্রন্থন

সিটি বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

৯৭ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কলিকাতা-৯



অঙ্গসজ্জা : পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

প্রথম সংস্করণ : মাঘ ১৩৬৬

ভূমিকা ঃ দেশ-কাল-পাত্র

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাচীন সাহিত্যের লিরিকধর্মী প্রেমের কবিতার একটি সংকলন বাঙালী পাঠকের সামনে উপস্থিত করা হল। এর আগে এ ধরনের কোনো সংকলন প্রকাশিত হয়নি। প্রথমেই যে-কথা বলা প্রয়োজন তা হল, এই সংকলন পণ্ডিত বা গবেষকের জন্যে নয়, রুচিবান ও মননশীল সাধারণ বাঙালী পাঠকের রসপিপাসার তৃপ্তিসাধনই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রেমের কোনো বিশেষ তত্ত্ব প্রতিপাদন বা প্রতিষ্ঠা করতে আমরা চাইনি।

প্রেমের আভিধানিক অর্থ যা-ই হোক, আধুনিককালে আমরা শব্দটিকে ঘিরে একটা ব্যঞ্জনার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে নিয়েছি। প্রেমের মূলে কাম, কিন্তু কাম যে প্রেম নয়, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না। যে বিচিত্র রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে কামের প্রেমে পরিণতি, তা আমাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু এই রূপান্তরের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রাচীনকালের বিভিন্ন জাতির ধারণা সর্বত্র একই রকম ছিল না ; আবার, প্রেম যে কাম নয়—কামের ঊর্ধ্বায়ণ, সে সম্পর্কেও কোনো প্রাচীন জাতিরই ধারণার পার্থক্য ছিল না। লিরিক সাহিত্যে বিভিন্ন জাতির প্রেমের যে-ধারণা ব্যক্ত হয়েছে, তার কিছুটা পরিচয় এই সংকলনে পাওয়া যাবে।

প্রেমের প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ জীবজগতের প্রত্যেকের সঙ্গে সমান, সে সাধারণ ; কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে সে উন্নীত, মহিমান্বিত, অসংখ্যের মধ্যেও বিশিষ্ট ও অসাধারণ। প্রেমই মানুষকে সর্বপ্রথম ব্যক্তিত্বের আস্বাদ দিয়েছে। সমাজে সভ্যতায় যখন ব্যক্তিবোধ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, প্রাণ-ধারণের প্রেরণায় মানুষ যখন কর্মে ও বিশ্বাসে যূথের সঙ্গে অভিন্ন, সেই আদিমকালেও পুরুষ কিংবা নারী সমষ্টি থেকে পৃথক হয়েছে পারস্পরিক আকর্ষণের চুম্বকে। প্রেম মূলে প্রাণধারণের স্থূল ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত ; সেখানে প্রেম নিছক প্রয়োজন, দেহের খাদ্য মাত্র। এবং

যেহেতু প্রাণধারণের নিশ্চিতির জন্যে সমাজে খাদ্যের উৎপাদন, বণ্টন ও সংরক্ষণ একটা নির্দিষ্ট বিধিনিষেধের গণ্ডিতে বাঁধা, সেই হেতু সমাজে প্রেমও চিরকাল নিয়ন্ত্রিত, সমাজ-সংস্কারের অঙ্গীভূত। আবার প্রেম যখন দেহকে ছাড়িয়ে মনেরও খাদ্য হয়ে ওঠে, তখন সেই ক্ষুধানিবৃত্তির উপায় কোনো বিধিবদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত পথে সব সময় সম্ভব হয় না। তখন তা সমস্ত বিধিকে—অন্ততঃ মনে মনে—অস্বীকার করে, এবং ক্ষেত্রবিশেষে সামাজিক রীতি-নীতিরও বিপর্যয় ঘটায়। প্রেমের প্রকৃতি চিরকালই প্রধানতঃ অ-সামাজিক। এবং এই জন্যেই চিরকাল লিরিকই প্রেমের অভিব্যক্তির মুখ্য প্রকাশ-রীতি। বোধহয় একথা বললে ভুল হয় না যে মানুষের প্রথম লিরিক সৃষ্টি প্রেমের প্রেরণা থেকেই। বিভিন্ন জাতির লিরিকধর্মী প্রেমের কবিতার রসোপলব্ধির জন্যে তাই আমরা বিভিন্ন সাহিত্যের লিরিকধারা ও জাতিগত প্রকৃতির অতি সংক্ষিপ্ত পৃথক পৃথক আলোচনা প্রয়োজন বলে মনে করেছি।

* *

ভারতীয় সাহিত্যে প্রাচীনতম প্রেমের কবিতার সন্ধান পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। দশম মণ্ডলে দুটি দীর্ঘ এবং প্রায় সম্পূর্ণ সংবাদ-সূক্ত আছে। একটির ঋষি যম ও যমী, অপরটির পুরুরবা ও উর্বশী। যম-যমী সূক্তের বিষয়বস্তু সহোদর যমের প্রতি যমীর প্রবল কামজ আকর্ষণ ও যমের প্রত্যাখ্যান; পুরুরবা-উর্বশী সূক্তের বিষয় বিরহী পুরুরবার মিলনকামনা ও উর্বশীর সান্ত্বনা। যম-যমীর সূক্তটি অসাধারণ বলিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও কামের নগ্ন ও বিকৃত প্রকাশ বলে হয়তো উপেক্ষিত হতে পারে, কিন্তু পুরুরবা-উর্বশী সূক্ত যে-কোনো যুগের যে-কোনো রুচির মানদণ্ডেই প্রেমের কবিতারূপে গৃহীত হবে। পুরুরবা-উর্বশীর প্রেমকাহিনী ভারতীয় সাহিত্যে চিরায়ত কাহিনী। এ কাহিনী ঋগ্বেদেরও পূর্ববর্তী; সম্ভবতঃ প্রাক-বৈদিক লোকসাহিত্যের এমন একটি জনপ্রিয় আখ্যান, বিষয়বস্তুর গৌরবে যা ঋগ্বেদে স্থান করে নিয়েছিল। সংবাদ-সূক্তের বিশিষ্ট ভঙ্গিও সম্ভবতঃ লোক-কাব্যেরই ভঙ্গি।

পুরুরবা-উর্বশী-সংবাদ কাহিনী ছাড়াও আর এক নারী-ঋষির দুটি ঋককে

প্রেমের কবিতার মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। এই নারী-ঋষি লোপামুদ্রা। দুটি ঋকে লোপামুদ্রা ভোগস্পৃহাহীন, উদাসীন, তপস্বী স্বামীকে অকপট ভাষায় নিজের কামনা ব্যক্ত করেছেন। এর মধ্যে যে বেদনাবোধ, যে আক্ষেপের সুর, তা একান্ত ব্যক্তিগত হয়েও যেন নিখিল নারীত্বের আকূতিই ধ্বনিত করেছে।

বৈদিক সূক্তগুলি রচনার ও সংকলনের উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখলে ঋগ্বেদে অথবা পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে প্রেমসংক্রান্ত বেশি কিছু আশা করাই বৃথা; তবু যে-কটি সূক্ত মিলেছে তাদের মূল্য অপরিসীম। এগুলি কেবল ভারতীয় সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর সাহিত্যে প্রাচীনতম প্রেমের কবিতা।

চতুর্বেদের মধ্যে অথর্ববেদ সবচেয়ে অর্বাচীন। ভোগসুখাকাঙ্ক্ষী মর্ত্য-মানবের জীবনের ধর্মসম্পর্কহীন বাসনাকামনার যে-দিকগুলি পরমার্থকামী ঋষিরা পরিহার করে চলার চেষ্টা করতেন, অথর্ববেদের মন্ত্রগুলি তারই বহুমুখী প্রকাশ। স্বভাবতই কামপ্রসঙ্গ বহু সূক্তের বিষয়বস্তু। ঋগ্বেদের বি-মূর্ত কামকে সর্বপ্রথম বিশিষ্টরূপে পাই অথর্ববেদে। মনের প্রথম বীজ কাম, যা ছিল যৌন অযৌন যে কোনো কামনা, অথর্ববেদে তা সকল দেবতারও বড়ো, কখনো কখনো অগ্নির সঙ্গে অভিন্ন; শুধু তাই নয়, অথর্ববেদে কাম মন্মথ, তার তীক্ষ্ণশায়ক হৃদয় বিদ্ধ করে। এ যেন পরবর্তী যুগের অতি পরিচিত পুষ্পধনু মদনের পূর্বাভাষ। যে সূক্তে কামের এই বর্ণনা আছে সেটি ঈপ্সিত নারীকে আয়ত্ত করার আভিচারিক মন্ত্র। মন্ত্র মানেই প্রার্থনা, কোনো কামনার অভিব্যক্তি; সে কামনা যদি তীব্র হয়, প্রার্থনা যদি আন্তরিক হয়, তাহলে মন্ত্রকারের হৃদয়াবেগে তা অতি সহজেই কবিতা পদবীতে উন্নীত হয়। অথর্ববেদের এই মন্ত্রটি সম্পর্কেও এই কথাই প্রযোজ্য। অতি উচ্চাঙ্গের না হলেও এটি যে কবিতা এবং প্রেমের কবিতা, তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ঠিক এই ধরনের আরও একটি মন্ত্র আছে। সেটির মন্ত্রকার নারী। সেখানে কামনার তীব্রতাও বিস্ময়কর। মন্ত্রটি যেন এক কামনাক্ষুব্ধ নারীহৃদয়ের তপ্ত আলোড়ন। এবং এর কাব্যগুণও তর্কাতীত।

প্রাচীন লোককাব্যের বহু প্রেমকাহিনী বা আখ্যান এবং গাথা বৈদিক পরবর্তী যুগের সাহিত্য, মহাকাব্য ও পুরাণে গৃহীত হয়েছে সত্য, কিন্তু কোথাও বিশুদ্ধ প্রেমের কাহিনী হিসাবে বর্ণিত হয়নি। কাহিনীগুলি সেখানে গুরুতর নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন বা ধর্মাদর্শ প্রচারের নিছক উপায় মাত্র। শুধু একমাত্র ব্যতিক্রম রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে; সেখানে বিরহী রামের বিলাপ শুদ্ধ প্রেমের মহিমায় সত্যিই উজ্জ্বল।

লোককাব্য-ধারার সুস্পষ্ট চিহ্ন পালি সাহিত্যেও বর্তমান। কিন্তু কাম বা প্রেম সম্পর্কে বৌদ্ধদের উপেক্ষা ছিল ব্রাহ্মণদের চেয়ে সহস্রগুণে তীব্র। ব্রাহ্মণাদর্শে কাম বা প্রেম মহিমান্বিত না হলেও জীবনে ও সমাজে সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত। ব্রাহ্মণ্য দেবগোষ্ঠীতে মদনের স্থান আছে, মদনও বিশিষ্ট দেবতা। কিন্তু বৌদ্ধদের কাছে কামদেবতা মার মৃত্যুর দেবতা। স্বভাবতই বৌদ্ধদের রচিত সাহিত্যে প্রেমের কাব্যকবিতার সন্ধান করা পণ্ডশ্রম মাত্র। তবু উষর পালি সাহিত্যেই বিচরণ করতে করতে এক অতি আশ্চর্য গাথার সাক্ষাৎ মিলে যায়। গাথাটির বিষয় ধর্মসম্পর্কহীন বিশুদ্ধ প্রেম ও তার মহিমা কীর্তন। মূল প্রসঙ্গের সঙ্গে গাথাটির সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। খুব সম্ভব গাথাটি প্রাচীন লোককাব্যের একটি ছিন্ন অংশ, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ দীঘ নিকায়ে স্থান লাভ করেছিল। পালি সাহিত্যের নিঃসঙ্গ একক এই স্পর্ধিত প্রেমের কবিতাটির তুলনা অন্যত্র কোথাও মেলা ভার।

সংস্কৃত সাহিত্যে দেহনিষ্ঠ প্রেমের কবিতার প্রাচুর্য ক্লাসিকাল পর্বে। এ পর্বের গদ্যে পদ্যে ও নাটকে নরনারীর প্রেমের নিত্য উপস্থিতি। কিন্তু এই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, সংস্কৃত কোনো কাব্যেই প্রেম কখনো স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হয়নি। প্রেম বর্ণিত হয়েছে অন্য অনেক কিছুর প্রসঙ্গক্রমে, বিবৃতি ও বর্ণনার মাধ্যমে। শুধু এর ব্যতিক্রম ঘটেছে কালিদাসের কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের দুটি সর্গে—রতিবিলাপ ও অজবিলাপের ক্ষেত্রে। মহাকাব্যের অঙ্গীভূত হলেও এই দুটি অংশ যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র লিরিক কবিতা। দুটি অংশকেই প্রসঙ্গচ্যুত করে পৃথকভাবে আস্বাদ করা সম্ভব। কালিদাসের মেঘদূত প্রেমকাব্য বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অবিমিশ্র প্রেম তারও বিষয়ীভূত নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে অবিমিশ্র প্রেমের কবিতার স্বতন্ত্র কোনো ধারা নেই।

যা আছে, তা ক্লাসিকাল পর্বের নতুন ও ব্যাপক লিরিক ধারার অংশ মাত্র। আঙ্গিকের দিক থেকে কবিতাগুলি এক একটি স্তবকের মধ্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এবং অনেকগুলি স্তবক নিয়ে এক একটি কবির সংকলন বা শতক গ্রন্থের সৃষ্টি। বক্তব্য বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে সমগ্রভাবে স্তবকগুলির মধ্যে একটা ঐক্য খুঁজে পাওয়া গেলেও স্তবকগুলির পারস্পরিক কোনো যোগসূত্র নেই। প্রত্যেকটি স্তবকই বিচ্ছিন্ন, বিশিষ্ট ও সম্পূর্ণ। একথা বুঝতে দেরি হয় না যে, কবিতার এই একটিমাত্র আঙ্গিককে শিরোধার্য করে নিলে প্রেমের সর্বব্যাপী অনুভূতি, হৃদয়ের গভীর আলোড়ন, আনন্দ বেদনার চক্রাবর্তন—এক কথায় প্রেমের সার্বিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, এতে শুধু মুহূর্তগুলি ধরাই সম্ভব। এবং সংস্কৃত কবিরাও কবিতায় এই মুহূর্তগুলি ধরতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিরহ, মিলন, মান, অভিমান, ঈর্ষা, রোষ, আনন্দ, বেদনা—প্রেমের বিচিত্র অনুভূতির সূক্ষ্মতম ভেদও তাঁদের চোখ এড়ায়নি।

মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত হালের গাহা সত্তসঈ ভারতীয় প্রেমের কবিতার প্রাচীনতম সংকলন। এতে অসংখ্য কবির রচনা স্থান পেয়েছে। নারী কবির সংখ্যাও কম নয়। বৈধ অবৈধ, সূক্ষ্ম স্থূল, শ্লীল অশ্লীল—প্রাণবন্ত সুস্থ সবল গ্রামসমাজে নবনারীর জীবনে প্রেমের যতরকম ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য সম্ভব সবই কবিতার বিষয়ীভূত হয়েছে। প্রেম নামক হৃদয়বৃত্তির বিস্তার যে কত ব্যাপক, হাসি অশ্রু, মান অভিমানের আলোছায়ায় তার যে কত বর্ণবৈভব, গাহা সত্তসঈ-র আগে ভারতীয় সাহিত্যে তা অপরিচিত ছিল। হালের উক্তি থেকেই জানতে পারি, প্রাকৃত কবিতার মুখ্য বিষয় ছিল প্রেম। তিনি কোটি গাথার মধ্যে থেকে বাছাই করে সাতশ গাথাকে সংকলনে স্থান দিয়েছিলেন। প্রাকৃত প্রেমের কবিতার ধারা যে লোকসাহিত্যের প্রভাবে পুষ্ট হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

প্রাকৃত সাহিত্যে যেমন হালের স্থান, সংস্কৃতে তেমনই কবি অমরুর। অমরুই সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেম-কবিতার ধারার পথিকৃৎ। অমরুর পটভূমি খুবই ছোট, পরিবেশও সম্পূর্ণ নাগরিক, সুতরাং সেদিক থেকে বৈচিত্র্যের অভাব। কিন্তু অমরুর কবিতায় সে অভাব পূরণ হয়েছে কল্পনা ও অনুভূতির অসাধারণত্বে। সংস্কৃত রসসাহিত্যের প্রথা-সিদ্ধ জগতই অমরুর বিচরণ

ক্ষেত্র; আর দশজন সংস্কৃত কবির মতো তাঁর কবিতাও কেবলমাত্র বিদগ্ধ ও পরিশীলিত মনের উপভোগ্য বিশুদ্ধ আনন্দের বস্তু; ভাবালুতায় ও কাল্পনিকতায় তিনিও সকলের মতোই প্রেমকে তরল চিত্তবিলাসে পরিণত করেছেন; সে প্রেমে আনন্দের উচ্ছলতা যতটা, উদ্বেলতা তার চেয়ে অনেক কম, বিরহ আন্তরিকতাশূন্য, বেদনা কৃত্রিম। কিন্তু আবার, অমরুর কবিতায় যা আছে অন্য কবিদের রচনায় তা অনুপস্থিত। অমরুর কবিতাতেই মাঝে মাঝে অনুভূতির গভীরতা এমন এক উচ্চগ্রামে পৌঁচেছে যেখানে প্রেমের আনন্দবেদনা কেবলমাত্র উপভোগ্য হয়েই শেষ হয়নি, জীবনের মহত্তম ও বৃহত্তম উপলব্ধিরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

অমরুর পরেই উল্লেখযোগ্য কবি ভর্তৃহরি। ভর্তৃহরি শৃঙ্গার ও বৈরাগ্য দুই বিপরীত হৃদয়বৃত্তি নিয়েই সমান কৃতিত্বের সঙ্গে কবিতা লিখেছেন। ভাব, ব্যাপ্তি ও প্রকাশের সূক্ষ্মতায় ভর্তৃহরির কবিতা অমরুর চেয়ে উচ্চস্তরের না হলেও আন্তরিকতা ও স্পষ্টবাদিতায় অনেক বেশি আবেদনশীল। প্রেম সম্পর্কে ভর্তৃহরির দৃষ্টিকোণও অভিনব। ভর্তৃহরির দৃষ্টিতে প্রেম জীবনের এক প্রবল ও বাস্তব অনুভূতি; তাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। প্রেমের আনন্দ যেমন সত্য, তার যন্ত্রণাও তেমনি সত্য। অমরুর প্রেমে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে কোনো বিরোধ ঘটে না, জীবনের অন্যান্য দিক সম্পর্কে সে প্রেম উদাসীন, আপনাতেই আপনি মগ্ন ও সম্পূর্ণ। কিন্তু ভর্তৃহরির কাছে বৃহত্তর জীবন উপেক্ষিত নয়; জীবনে ভোগ ও বৈরাগ্য, প্রেম ও মুক্তি দুইই সত্য, অথচ পরস্পরবিরোধী। হয় প্রেম, নয় বৈরাগ্য, কোনো মধ্যপথ নেই। এই বিশেষ দৃষ্টিকোণের ফলেই ভর্তৃহরির পক্ষে সমান আবেগে দুই বিপরীত হৃদয়বৃত্তির মহিমাকীর্তন করা সম্ভব হয়েছিল।

অমরু ও ভর্তৃহরির পরবর্তী যুগে রচিত প্রেমের কাব্য ও কবিতার সংখ্যা প্রচুর, কবিদের সংখ্যাও অনেক, বহু কবিও শক্তিমান। কিন্তু পূর্ববর্তীদের অনুকরণ ও প্রথার অনুসরণের আত্যন্তিক প্রচেষ্টায় এইসব কবিদের অধিকাংশ রচনাই বিশেষত্বহীন। হৃদয়াবেগের চেয়ে বড়ো শব্দের কারুকার্য ও রচনার পারিপাট্য। সংস্কৃত প্রেমের কবিতা নিঃসন্দেহে দেহনিষ্ঠ। প্রেমের কোনো বি-মূর্ত ধারণা ভারতীয় কবিদের অগোচর ছিল। কামই প্রেমের ভিত্তি,

প্রেমের অঙ্কুর, বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি একমাত্র দেহকেই কেন্দ্র করে। কিন্তু পরিণামে প্রেম দেহাতীত, দেহগত সমস্ত অনুভূতির ঊর্ধ্বে এক আনন্দঘন উপলব্ধি। এই জন্যে প্রেমের প্রসঙ্গে দেহগত কোনো বর্ণনা বা উল্লেখে কবিদের তিলমাত্র কুণ্ঠা নেই। দেহ তাঁদের কাছে উপায়, লক্ষ্য ভাবের উদ্বোধন, রসসৃষ্টি। সংস্কৃত কবিতায় এই লক্ষ্য যে সর্বত্রই প্রতিফলিত হয়েছে তা মনে করা ভুল। বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উপায়ই লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। অমরু ও ভর্তৃহরির পরবর্তী যুগের কবিদের রচনায় এইটেই সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ে।

দু-একজন নারী-কবির কথা বাদ দিলে পরবর্তী যুগেব কবিদের মধ্যে প্রেমের কবিতায় জয়দেব নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। বিহ্লনের যতই জনপ্রিয়তা থাক, তাঁর চৌর পঞ্চাশিকা প্রেমের কবিতার মর্যাদা পুরোপুরি পেতে পারে না। জয়দেবের গীতগোবিন্দ আঙ্গিকের দিক থেকে যাই হোক, আবেদনে পুরোপুরি লিরিক। কালিদাসের মেঘদূত থেকে বিশুদ্ধ লিরিক অংশগুলিকে পৃথক করা কঠিন না হলেও খণ্ডাংশের মধ্যে রসের পূর্ণ উপলব্ধি ব্যাহত হয়। কিন্তু গীতগোবিন্দের যে-কোনো অংশই পৃথকভাবে সম্পূর্ণ আস্বাদযোগ্য।

* *

মিসরীয় সাহিত্য খ্রীষ্টজন্মেরও সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার পুরনো। কিন্তু সে সাহিত্যের প্রেমের কবিতার যে নমুনা আমাদের হাতে আছে, তার বয়স ঋগ্বেদের চেয়ে বেশি মনে করার কোনো কারণ নেই। মিসরীয় সাহিত্যের পুরনো রচনায় ভাষার যে-রূপ চোখে পড়ে, পণ্ডিতদের মতে তা রীতিমতো সাহিত্যিক, ভঙ্গিতে ও বিন্যাসে সুনির্দিষ্ট প্রথার অনুবর্তী। পণ্ডিতেরা এও বলেন, এ ভাষা দৈনন্দিন জীবন থেকে এত দূরগত হয়ে উঠেছিল যে খ্রীষ্টজন্মের তেরশ বছর আগে তাকে নতুন করে ঢেলে সাজতে হয়েছিল। প্রেমের কবিতাগুলি এই নতুন ভাষায় লেখা। পুরনো ভাষায় লেখা সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল মূলতঃ ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা। স্বভাবতই লোকায়ত জীবনের তাতে কোনো স্থান ছিল না।

জাতি হিসেবে প্রাচীন মিসরীয়রা যথেষ্ট প্রাণধর্মী ছিল, জীবনের প্রতি তাদের টান ছিল সুগভীর, আনন্দ উপভোগের কামনা ছিল তীব্র। আনন্দময়

এ জীবন অতি হ্রস্ব, এটি অমোঘ সত্য ; কিন্তু মিসরীয় মন যেন এই সত্যকে অস্বীকার করতে চাইত। মৃত্যুর পরে নতুন জন্ম নয়, এই জীবনই দীর্ঘায়িত হোক, অনন্ত হোক—এই কামনাই তারা করত। ভোগের বিপুল আয়োজন ও উপকরণের মধ্যে পিরামিডের অন্ধকার গর্ভগৃহে হাজার হাজার বছর ধরে ঘুমন্ত প্রতাপশালী ফ্যারোদের মমী-র মনে ছিল এই একই কামনা, পঞ্চভূতে গড়া নশ্বর দেহকে অবিকৃত রাখার জন্যে তাই ছিল তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

প্রাচীন মিসরের যে গুটিকয়েক প্রেমের কবিতা আমরা পেয়েছি, সেগুলি প্রধানতঃ গান। নতুন যুগের নতুন ভাষায় লেখা হলেও এগুলি মূলতঃ লোক-সঙ্গীতের নিদর্শন কিনা, সে সম্পর্কেও সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। এমন কয়েকটি কবিতা আছে যার পরিবেশ গ্রামীণ, ভাব প্রকাশের ভঙ্গিও প্রাকৃত-জনোচিত সহজ সরল ও আন্তরিক। কিন্তু একাধিক কবিতার ভাবে ও ভঙ্গিতে বিদগ্ধতার ছাপও অত্যন্ত স্পষ্ট। উপমা উৎপ্রেক্ষার নির্বাচন ও প্রয়োগের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট নিয়মাবদ্ধ রীতিও চোখে পড়ে। এইসব কবিতার পরিবেশ, পরিমণ্ডল ও প্রকরণগুলি পরিশীলিত ও বিদগ্ধজনোচিত। কিন্তু সাধারণভাবে সমস্ত কবিতার গুণই হচ্ছে বক্তব্যের স্পষ্টতা ও আবেগের তীব্রতা। সবকটিই খাঁটি লিরিক। সব কবিতার মধ্যেই আবেগ, অনুভূতি ও প্রকাশভঙ্গির এমন একটা নৈকট্য আছে যাতে এদেব গোত্র পৃথক করে ধরা কঠিন। মনে হয়, একথা বলাই সঙ্গত যে, দুই গোত্রের মেলবন্ধনই ছিল মিসরীয় লিরিকের বিশেষত্ব।

এই কবিতাগুলিতে প্রেমের আনন্দ যেমন তীব্র, তেমনই তীব্রতা প্রেমের বেদনায়। দেহজ আকর্ষণের মত্ততা উচ্চকণ্ঠেই ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই তাতে স্থূলতা স্পর্শ করেনি, কিংবা তা নিছক কামের উদ্গার হয়ে ওঠেনি। দেহ ও মন যেন একই ছন্দে, একই আবেগে আন্দোলিত হয়ে উঠেছে। প্রাচীন সাহিত্যে প্রেমের এ পরিচয় কিছুটা অভিনব বটে।

প্রাচীন মিসরীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল আর একটি প্রাচীন জাতি, ইতিহাসে তারা ইহুদী নামে পরিচিত। কিন্তু প্রাণোচ্ছল মিসরীয় জীবনের সঙ্গে তাদের কী বিস্ময়কর পার্থক্য! হিব্রু সাহিত্য তিন হাজার

বছরের প্রাচীন, তার বিবর্তনের ইতিহাসও অবিচ্ছিন্ন। সে সাহিত্যে একটি প্রখর আত্মচেতনা সম্পন্ন ভাগ্যতাড়িত জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা, গর্ব অভিমানের সবটুকু পরিচয় আছে, নেই শুধু কামনাবাসনায় আন্দোলিত নরনারীর হৃদয়ঘটিত কোনো সংবাদ। ইহুদী ধর্মেরই এমন একটা স্বাতন্ত্র্য আছে যা দুর্জয় ও দুর্মর, যার প্রবল প্রভাবে জাতির সাহিত্যে দু-হাজার বছরের মধ্যে কোনোদিন লোকায়ত জীবন স্থান লাভ করতে পারেনি।

দীর্ঘ দু-হাজার বছরের মধ্যে রচিত হিব্রু সাহিত্যে একমাত্র প্রেম-কাব্য ওল্ড টেস্টামেণ্টের রাজা সলোমনের গীতাবলী। ইহুদী ও খ্রীষ্টান ভাষ্যকারেরা এদের যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই দিন না কেন, এগুলি খাঁটি লৌকিক প্রেমের কবিতা অথবা বিবাহের মঙ্গলগীতি। প্রেমের কবিতা হিসেবে এগুলি অতুলনীয়। লৌকিক প্রেম-গীতের সবকিছু বিশিষ্ট্যই এদের মধ্যে প্রায় অবিকৃত রয়েছে। এগুলি যে একই সময়ের রচনা নয় তা বুঝতে কষ্ট হয় না, বক্তব্যের ঐক্য সত্ত্বেও এগুলিব ধারাবাহিকতা কৃত্রিম উপায়ে রক্ষিত, বহু হস্তাবলেপে জায়গায় জায়গায় অর্থ দুর্বোধ্য, সলোমনের সঙ্গে এদের সম্পর্কও হয়তো অনৈতিহাসিক; কিন্তু প্রাচীন হিব্রু লোকগীতের নিদর্শন, বিশেষ করে, ইহুদীদেব মতো উগ্র ধর্মবোধসম্পন্ন জাতির আবরণমুক্ত হৃদয়ের পরিচয় হিসেবে এগুলি অসাধারণ মূল্যবান।

খ্রীষ্টজন্মের বেশ কিছু আগেই ওল্ড টেস্টামেণ্টের চূড়ান্তরূপ স্থির হয়ে গিয়েছিল। তখন থেকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত হিব্রু সাহিত্য মিশ্‌না ও তালমুদ-এর বিচার, বিশ্লেষণ ও সম্পাদনারই ইতিহাস। ধর্মসম্পর্কহীন বিষয়বস্তু নিয়ে কাব্যকবিতা রচনার দুঃসাহস দশম শতাব্দীর আগে কোনো ইহুদী কবির পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। দু-হাজার বছর পর সর্বপ্রথম স্পেনের কবিরাই অসীম সাহসে নতুন পথে পা বাড়ান। হিব্রু সাহিত্য এই প্রথম প্রকৃত সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে ওঠে। এর পেছনে ছিল আরবী সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব। আরবী কাব্যের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু হিব্রু সাহিত্যে অবাধ প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়েছিল। হিব্রু সাহিত্যের স্বল্পস্থায়ী স্বর্ণ-যুগের সূচনা এই থেকেই। প্রেম ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে কাব্যরচনায় তখন থেকে ইহুদী কবিরা আরবী কবিদের সঙ্গে পাল্লা দিতে থাকেন। কিন্তু

প্রেমের কবিতায় আরবীর সঙ্গে হিব্রুর কোনো তুলনাই চলে না। শ্রেষ্ঠ কবি জুদা হা-লেভি-র কোনো কোনো প্রেমের কবিতায় আবেগের তীব্রতা প্রবলভাবে নাড়া দিলেও সে প্রেমের প্রকৃতি যেন অনেক পরিমাণে বি-মূর্ত, দেহাতীত ও প্লেটোনিক। হিব্রু সাহিত্যের প্রেমের কবিতার দৈন্য কোনোকালে ঘোচেনি।

* *

পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্যগুলির মধ্যে একমাত্র চীনের সাহিত্যেই প্রেমের কবিতার ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান। ধর্মের পাশাপাশি লৌকিক জীবনের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি দিতে প্রাচীন সাহিত্যে চীনাদের মতো আর কেউ পারেনি। তার কারণ চীনাদের ধর্মবোধের স্বতন্ত্র প্রকৃতি এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রবাদ আছে, চীনের প্রাচীনতম কবিতা-গ্রন্থ শি চিঙ্-এর সংকলন করেছিলেন কন্‌ফুসিয়াস্ নিজে। শি চিঙ-এর প্রেমের কবিতাগুলি বারবার পড়ার জন্যে তিনি নাকি ছেলে পো য়ু-কে উৎসাহ দিতেন, বলতেন : এগুলি যে পড়ে না তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বলতেন : এদের মধ্যেই সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি আছে ; এগুলি উপলব্ধি করলে কেউ হয়তো স্বর্গে পৌঁছতে পারে, কিন্তু এদের বাদ দিয়ে স্বর্গে পৌঁছনো অসম্ভব। শি চিঙ্-এর সবকটি প্রেমের কবিতা লোকসঙ্গীত না হলেও, কিছু কিছু যে পুরোপুরি লোকসঙ্গীত তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু পরিবেশ পরিমণ্ডলের পার্থক্য ও প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতা সত্ত্বেও দুইজাতের মধ্যেই রীতি ও মানসিকতার সাধারণ ঐক্য চোখে পড়তে বাধ্য।

রূপরসগন্ধ প্রীতির মতো দেহপ্রীতিও চীনা মনের স্বভাবগত, বর্ণগন্ধরেখার মতো দেহমনও প্রত্যক্ষ সত্য। প্রত্যক্ষ যৌন রূপকল্পনা প্রতীক ব্যবহারে চীনাদের কুণ্ঠা নেই, অথচ যৌনতাকে প্রাধান্য দেবারও তিলমাত্র চেষ্টা নেই। তাদের কাছে জীবনের বৃহত্তর বোধের সঙ্গে কামবোধের কোনো বিরোধিতা নেই, তা একান্ত স্বাভাবিক ও সুন্দর। চীনা প্রেমের কবিতায় তাই কাম ও প্রেমের কোনো ভেদরেখা খুঁজে পাওয়া যায় না ; জীবনচর্যায় সামঞ্জস্য ও মাত্রাবোধ চীনা মনের যেমন ধর্ম, প্রেমের ধর্মও ঠিক তেমনই দেহমনের

সুসঙ্গতি ও ভারসাম্যে। এ প্রেম বলিষ্ঠ বয়ঃপ্রাপ্তের প্রেম, তার অস্তিবোধে ওতপ্রোত। তাতে অহেতুক রোমাণ্টিক প্রলেপের প্রয়োজন হয় না। চীনা প্রেমের কবিতায় তথাকথিত রোমাণ্টিক উচ্ছ্বাসও এইজন্যে চিরদিনই অনুপস্থিত। প্রেমের আনন্দবেদনার অভিব্যক্তি গভীর কিন্তু আশ্চর্যরূপে সংযমিত। যুগযুগান্তের সাহিত্যেও চীনা প্রেমের এই ধারণার—দেহ ও মনের, কাম ও প্রেমের যুগনদ্ধ রূপের—কোনো পরিবর্তন ঘটেনি ; কোনো যুগ বা কোনো ব্যক্তির রুচিরও পরিবর্তন ঘটাবার চেষ্টা করেনি।

চীনের সাহিত্যে কবির সংখ্যা যেমন প্রচুর, প্রেমের কবিতার সংখ্যাও তেমনি গণনাতীত। এমন কোনো উল্লেখযোগ্য কবি নেই যিনি প্রেমের কবিতা লেখেননি। চীনা কবিমাত্রেই সাধারণতঃ সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, শিক্ষা দীক্ষা, পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের দৃষ্টান্ত। প্রায় সকল কবিই কোনো না কোনো দিক থেকে রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চীনা সাহিত্যে সম্রাট কবিরও অসদ্ভাব নেই। হান বংশের সম্রাট উ তি এবং কাও তি চিরদিনই উঁচুদরের কবি হিসেবে স্বীকৃত।

হান বংশের পতনের পরবর্তী যুগ চীনের ইতিহাসে অশান্তি, উপদ্রব ও দুর্নীতিতে পঙ্কিল। মহাকবি তাও য়ুয়ান্-মিঙ এই সময়ের কবি। প্রাচীন চীনা কবিদের মধ্যে তাও য়ুয়ান্-মিঙের নাম পৃথকভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ আবেগের উদ্বেলতাকে সীমিত ও সংযমিত করাই চীনা মনের বিশেষত্ব, কিন্তু তাও য়ুয়ান্-মিঙের ক্ষেত্রে তার অনেকখানি ব্যতিক্রম। কাব্যসাধনায় ও জীবনাচরণে তিনি ছিলেন ঐতিহ্য থেকে অনেকখানি স্বতন্ত্র। তাঁর যে সুদীর্ঘ কবিতাটি সংকলনে গৃহীত হয়েছে, তাতে প্রেমের আবেগ যেন বিস্ফোরকের মতো শব্দে, অর্থে, অলংকারে ছড়িয়ে পড়েছে। এই একটি কবিতাতেই তাঁর মনোভঙ্গির বিশেষত্ব বোঝা যাবে।

তাঙ্ যুগে বড়ো কবিদের সংখ্যা অনেক। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, সমৃদ্ধ অর্থনীতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের উচ্চমানে তাঙ্ যুগ চীনের স্বর্ণযুগ। এ যুগের শিল্প ও সাহিত্যের সমুন্নতিও বিস্ময়কর। চাঙ্ চিউ-লিঙ, লি পো, তু ফু, তু মু এই যুগের কবি। এই যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি লি পো ও তু ফু-র অন্যান্য কবিতার মতো প্রেমের কবিতাতেও যুগের ছাপ অস্পষ্ট নয়।

সুঙ্‌ যুগের নারী-কবি লি ছিঙ্‌-চাও ছাড়া সম্ভবতঃ আগে ও পরের কোনো চীনা কবির কবিতাতেই প্রেম মুখ্য বিষয়বস্তু হয়ে ওঠেনি। প্রেমানুভূতি তীব্র বটে, কিন্তু জীবন ও প্রকৃতির বিচিত্র রূপরসের আবেদনের তীব্রতা মোটেই কম নয়। প্রেম সুন্দর ও স্বাভাবিক হলেও তাকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেবার মতো ভাবালু চীনা কবির মন নয়। জীবনের সকল অনুভূতির সঙ্গে প্রেমের সামঞ্জস্য করাই তার বিশেষত্ব। চীনা প্রেমের কবিতায় বিরহের করুণ মাধুর্যের দিকটাই সবচেয়ে উজ্জ্বল। সকল কবির রচনাতেই প্রতীক্ষা ও বিচ্ছেদের বেদনাই প্রবল। গভীর আনন্দ বা গভীর দুঃখ নয়, বিষণ্ণতাই চীনা প্রেমের কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

প্রেমের ধারণায় চীনা ও জাপানী মনের একটা সাধারণ ঐক্য আছে, কিন্তু প্রকাশভঙ্গিতে তাদের অনৈক্য গুরুতর। হৃদয়াবেগের সংযত প্রকাশে চীনা কবিরা অভ্যস্ত, তাঁদের কৃতিত্ব পরিমিতি বোধে। হৃদয়াবেগে তাঁরা কৃপণ নন; তাঁদের সংযম প্রাচুর্যেরই পরিচায়ক। কিন্তু জাপানী কবিতায় সংযম এমন স্তরে পৌঁচেছে যে তাকে শুধু সংযম বললে ভুল বলা হয়, তা যেন হৃদয়াবেগের চুলচেরা হিসেবিয়ানা। আবেগকে সংযত করতে গিয়ে যদি তার স্বতঃস্ফূর্ততা ব্যাহত হয়, তাহলে আর যাই হোক, অতি উচ্চাঙ্গের প্রেমের কবিতার সৃষ্টি সহজ হয় না। জাপানী সাহিত্যে প্রেমের কবিতা চিরকাল রচিত হলেও সংযমের অতিশয্যে প্রেমের প্রবল আবেগ যেন অনেকখানি রুদ্ধকণ্ঠ। জাপানী মানসিকতার প্রধান ধর্ম সুখ-দুঃখে নির্বিকারত্ব। সংযম ও নির্বিকারত্বে অনেক প্রভেদ। চীনা প্রেমের কবিতায় আনন্দ বেদনার অস্থৈর্য ও উদ্বেলতা না থাকলেও নরনারীর আবেগ-স্পন্দিত হৃদয়টিকে স্পষ্ট চেনা যায়; সে ক্ষেত্রে জাপানী কবিতায় হৃদয় যেন সংযমের কঠোর শাসনে সম্মোহিত, মিলনে বিরহে তার চাঞ্চল্য প্রায় অলক্ষ্যগোচর। জাপানী কবিতার আঙ্গিক সম্পর্কেও এই একই কথা। অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রাচীন 'ওয়াকা'-র প্রকারভেদ 'তান্‌কা' ও 'চোকা'-ই ছিল জাপানী কবিতার প্রধান আঙ্গিক। তার কারণ, ভাবকে কঠোরভাবে সংযমিত করার পক্ষে 'ওয়াকা'-র মতো আঙ্গিক আর দ্বিতীয় নেই।

সুরের চেয়ে ছবির প্রতি জাপানীদের আকর্ষণ বেশি। চীনা কবিতায়

সুর ও ছবি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু জাপানী কবিতায় ছবিরই প্রাধান্য। জাপানী কবিতার প্রাচীনতম সংকলন 'মানিয়ো শু'র কবিতাগুলিতেও এই প্রাধান্য অত্যন্ত স্পষ্ট। ছবির প্রতি আত্যন্তিক আসক্তিতে পরবর্তী কালের জাপানী কবিতা বড়ো বেশি পরিমাণে ইঙ্গিতময়। হেয়িয়ান যুগের প্রেমের কবিতাগুলি পরিশীলিত ও সুকুমার আবেগের ভাবাচিত্র হিসেবে অতুলনীয়। আবেগ ও অনুভূতির সূক্ষ্মতম স্তরগুলিও ইঙ্গিতে উদ্ঘাটিত হয়েছে ; কিন্তু ইঙ্গিত ও রেখার অতি প্রাধান্যে জাপানী কবিতায় বাক্‌সংযমের প্রবণতা ক্রমশই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। তার ফলে, পূর্ববর্তী নারা যুগের সারল্য সরসতা ও অকপট ঋজুতার পরিবর্তে কবিতায় প্রতীক ব্যবহার ও শিল্পগত কৌশল এতখানি মুখ্য হয়ে উঠেছে যে, অ-দীক্ষিতের পক্ষে সে কবিতার পূর্ণ রস গ্রহণ করা কঠিন। 'কোকিন শু'-র কবিতাগুলিতে তার পরিচয় মিলবে। ভাব ও ভাষার সংযম যে কত চূড়ান্ত রূপ নিতে পারে তার প্রমাণ জাপানী হাইকুগুলি। মাত্র সতের অক্ষরে এক একটা হাইকু সম্পূর্ণ হয়। এতে যে অসামান্য দক্ষতার প্রয়োজন, তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই ; কিন্তু প্রেমের সর্বব্যাপী আবেগ প্রকাশ করার পক্ষে হাইকু কবিতা বিশেষভাবে অনুপযুক্ত।

* *

গ্রীক লিরিক সাহিত্যে প্রেমের কবিতার প্রাচুর্য সত্ত্বেও সত্যিকারের প্রেমের কবিতার সংখ্যা আশ্চর্যরকমে কম। গ্রীক প্রেমের কবিতায় নর-নারীর দেহ সম্পর্কের উন্মাদনা, অস্থিরতা ও প্রচণ্ডতা আছে, কিন্তু তা মুখ্যতঃ দেহের প্রান্তেই সীমাবদ্ধ, তার ঊর্ধ্বায়ণ কখনো সম্ভব হয়নি। এবং কেন যে সম্ভব হয়নি তার কারণও আমরা জানি। গ্রীক মন নরনারীর যৌন-সম্পর্ক বা কামকে হৃদয়মূল্য দিতে পারেনি। তারা হৃদয়মূল্য দিয়েছে যাকে, আধুনিক যুগে আমরা তাকে কামের বিকৃতি বলেই মানি ; নর ও নারীর যৌন-সম্পর্ক নয়, নর ও নর অথবা নারী ও নারীর সম্পর্কই সত্যি-কারের গ্রীক প্রেমের মূল ভিত্তি। গ্রীক কাব্য কবিতায় প্রেম বলতে যা বোঝায়, তা প্রধানতঃ এই অ-স্বাভাবিক সম-কামিতারই ঊর্ধ্বায়ণ, তারই জয়গান। এই সম-কামী প্রেম গ্রীক মনে এতই বদ্ধমূল ছিল যে, নরনারীর

দেহ-মন সম্পর্কে প্রেমের ধারণা সেখানে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এইজন্যেই নারীর মনস্তত্ত্ব ও হৃদয়ের রহস্য সম্পর্কে গ্রীক কবিদের জ্ঞান এত সীমাবদ্ধ; নরনারীর প্রেমের অনুভূতির ব্যাপারে তাঁরা এত উদাসীন।

কামের প্রচণ্ড প্রভাব সম্পর্কে গ্রীকরা ভারতীয়দের মতোই অতি প্রাচীন কাল থেকেই সচেতন। গ্রীক কামদেবতা এরস্-ও অতি প্রাচীন, গ্রীক সভ্যতার প্রত্যুষেই তাঁর জন্ম। কিন্তু কামকে শক্তিশালী মনে করেও গ্রীকরা জৈবিক প্রয়োজনের উর্ধ্বে তাকে স্থান দিতে চায়নি, আবার বর্জন করারও কোনো চেষ্টা করেনি। কামবর্জিত বিশুদ্ধ জীবন ও মননে গ্রীকদের কোনোদিনই আস্থা ছিল না। কাম থেকে গুণগতভাবে পৃথক প্রেমের ধারণা গড়ে তুলতে গ্রীকদের অনেক দেরি হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক প্রাচীন জাতির তুলনায় আর্যভাষীদের মনে কাম থেকে প্রেমের ধারণায় পৌঁছবার গতি অনেক বেশি মন্থর। অন্যান্য জাতির মনের ক্ষেত্রে যে-কারণই থাক না কেন, গ্রীক মনের ক্ষেত্রে সম-কামপ্রবণতাই যে এই মন্থরতার অন্যতম কারণ ছিল তা বুঝতে দেরি হয় না।

বিষয়বস্তু হিসেবে নরনারীর প্রেম গ্রীক কবি ও নাট্যকারদের কাছে মোটেই আদৃত ছিল না। কাম অথবা প্রেম ট্রাজিডিতে অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল। ইস্কিলাসের আগামেম্‌নোন ছাড়া পূর্ববর্তী কোনো ট্রাজিডিতেই নরনারীর যৌনসম্পর্ক বিষয়বস্তু হয়েছিল বলে জানা নেই। সোফোক্লেস্ একাধিক নাটকে যৌন-কামনাকে স্থান দিলেও ফিদ্রা ছাড়া অন্য কোথাও তা কাহিনীর মুখ্যবস্তু হয়ে ওঠেনি। একমাত্র ইউরিপিদিসের নাটকেই প্রেম মুখ্য স্থান লাভ করেছে। ইউরিপিদিসের প্রেমে কামনার প্রচণ্ডতা, স্বর্গীয় আনন্দের আস্বাদ ও অগাধ রহস্যের ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও তা নিঃসন্দেহে একদেশদর্শী; তাঁর নাটকে নায়িকারাই প্রেমসন্তপ্তা, নায়কেরা নির্বিকার।

নর ও নারী উভয়ের পারস্পরিক আকর্ষণের কাহিনী নাট্যায়িত করা নতুন কমেডির আগে সম্ভব হয়নি। অবশ্য একথা ঠিক যে, মহাকাব্য বা নাটকে না হোক, গ্রীক লিরিক সাহিত্যে প্রেম প্রসঙ্গ চিরকালই অল্পবিস্তর স্থান পেয়ে এসেছে। প্রাচীন লিরিক সাহিত্যে সমকামিতার জয়গানই বেশি।

সম-কামিতাকে বাদ দিলে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিরিক কবি সাপ্‌ফোর অপূর্ব সুন্দর কবিতা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। গ্রীক সাহিত্যে প্রেমের কবিতার প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে অনেক পরে হেলেনিক যুগে, তাও মূল গ্রীসে নয়, বিশেষ করে আলেকজান্দ্রিয়ায়। এর মূল কারণ গ্রীক মনে সম-কাম প্রবণতার পশ্চাদপসরণ ও ক্রমবর্ধমান বিদেশী প্রভাব। সমাজে নারীর অবস্থার পরিবর্তনও একটি কারণ।

গ্রীক প্রেমের কবিতায় দেহাসক্তির দিকই প্রবল একথা নিঃসন্দেহে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে, দেহাসক্তি কখনো শালীনতার গণ্ডি পার হয়নি। গ্রীক দেহাসক্তি জীবনের আনন্দ উপভোগের স্বভাবগত প্রেরণা। গ্রীকদের কাছে যৌবন ছিল সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। তাদের শিল্প-সাহিত্য যৌবনের জয়গানেই মুখর। যৌবন ও প্রেম অবিচ্ছেদ্য, তাই প্রেমের প্রতি গভীর আসক্তি তাদের মানসিকতার প্রধান উপাদান। অন্য জাতিদের তুলনায় তাদের পার্থক্য এইখানে যে, তারা প্রেমের দ্বৈত ধারণা গড়ে তুলেছিল। তাদের বিশেষ মানস-প্রকৃতি সমকামিতাকেই এমন এক উচ্চ মানসিক মূল্য দিয়েছিল যা পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনারহিত। যা বিকৃতি, যা অস্বাভাবিক তাকেই তারা উপলব্ধির স্তরে উন্নীত করেছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রাচীন গ্রীসের উর্বরতম যুগেই সমকামিতার প্রবণতা ছিল তুলনায় সবচেয়ে বেশি প্রবল। এবং এই প্রবণতার প্রাবল্যেই জন্ম হয়েছিল সাপ্‌ফোর কবিতার। সোক্রাতেস ও তাঁর শিষ্যবর্গের সম্পর্কের মধ্যেও এই প্রবণতাই সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছিল। সমকামিতা গ্রীক-সভ্যতার অবক্ষয়ের বিকৃতি প্রবণতা নয়, এই প্রবণতার মধ্যেই সে সভ্যতার অগ্রগতির পদক্ষেপ। পরবর্তীকালে গ্রীক মনে সমকামিতার প্রাবল্য কমে গিয়েছিল, কিন্তু কোনোকালেই লুপ্ত হয়নি। পরবর্তীকালের লিরিক কবিরা তাই সকলেই প্রেমের দ্বৈত আবেগে ঘুরপাক খেয়েছেন। আর এইজন্যেই, প্রচলিত অর্থে প্রেমের কবিতার সংখ্যা গ্রীক-সাহিত্যে এত কম।

চীনের পরেই যেমন জাপানের, গ্রীসের পরেই ঠিক তেমনি রোমের প্রসঙ্গ আলোচনা অবধারিত। চীনের সুপ্রাচীন শিল্প ও সাহিত্যের অনুকরণ করতে গিয়ে অল্পকালের মধ্যেই জাপানীরা নিজস্ব প্রতিভার সন্ধান পেয়েছিল,

অনুকরণ তাদের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু রোমের যা-কিছু সৃষ্টি, তা গ্রীসের ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র। জাতি হিসেবে রোমানদের নিজস্ব প্রকৃতিই তার কারণ। শিল্প-সাহিত্যের অন্যান্য দিকের মতো প্রেমের কাব্য কবিতাও তার প্রমাণ।

রোমান প্রকৃতি ছিল পরিশ্রমী, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন চাষী ও কষ্টসহিষ্ণু সৈনিকের প্রকৃতি। সে প্রকৃতি একেবারে গদ্যময়; মৌলিক কোনো সভ্যতা গড়ে তোলার মতো বুদ্ধি বা হৃদয়ের ভিত্তি সে প্রকৃতিতে ছিল না, স্থূল ইন্দ্রিয়ালুতাই তার বিশেষত্ব। প্রবল ইন্দ্রিয়ালুতা গ্রীক মনেরও স্বধর্ম, কিন্তু গভীর সৌন্দর্যবোধ তার সঙ্গে ওতপ্রোত। রোমান মনে ইন্দ্রিয়ালুতার সঙ্গে জড়িত ছিল বর্বরতা ও ধর্ষকামিতা। সৌন্দর্যবোধের স্বভাবগত প্রেরণাই তার ছিল না। প্রেমের কাব্য কবিতা তো দূরের কথা, সাধারণ অর্থে সাহিত্য ও শিল্প গড়ে তোলার মতো মানস উপকরণেরই অভাব ছিল রোমান প্রকৃতিতে। এমন প্রকৃতি প্রেম-সাহিত্য রচনা করলে যা হওয়া স্বাভাবিক, রোমানদের ক্ষেত্রেও তাই-ই হয়েছে: হয় তা হয়েছে গ্রীকদের অন্ধ অনুকরণ, নয়তো, ইন্দ্রিয়লিপ্সার নির্লজ্জ স্বীকৃতি।

গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার আগে পর্যন্ত রোমের সৃষ্ট সাহিত্য ছিল একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। রোমের যা কিছু সৃষ্টি তা পরিচয় পর্বের পর থেকে। কিন্তু গ্রাক মনের গভীর সৌন্দর্যপ্রীতি, সৌষম্যবোধ ও কাঠিন্যমিশ্রিত কোমলতা বোমানদের উপলব্ধির বহির্ভূত ছিল। তাই ভাব ও বিষয়বস্তুর অন্ধ অনুকরণ ছাড়া তাদের কোনো গত্যন্তর ছিল না। রোমের কাব্য সাহিত্যের দিকপাল হিসেবে যাঁরা গণ্য, তাঁদের যা কিছু কৃতিত্ব তা হচ্ছে রোমান চরিত্রের সঙ্গে গ্রীক সুষমা ও সুসঙ্গতির সমন্বয় ঘটাবার আন্তরিক প্রচেষ্টায়। এবং তাতে যে অনেকে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিলেন তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু গ্রীক পালিশে রোমানদের 'বর্বর' হৃদয়ের অশালীনতা ঢাকা কখনো সম্ভব হয়নি।

রোমের সাহিত্যে কাতুল্লাস্ই প্রথম প্রেমের কবি। তাঁর মধ্যে যেটুকু অশালীনতা তা প্রাকৃতজনোচিত স্বাভাবিক, ওভিদের মতো আয়ত্ত-করা কৃত্রিম নয়। তাঁর কবিতায় তথাকথিত ভাবালুতাও কম। হোরেস অনেক

লিখেছিলেন। কিন্তু সত্যিকার প্রেমিক হৃদয় তাঁর ছিল না। হোরেসের চেয়ে তিবুল্লাস বা সেক্স্তাসের হৃদয়াবেগের প্রাবল্য অনেক বেশি এবং সে আবেগও ছিল অনেক আন্তরিক। প্রেমের কবি হিসেবে ওভিদের খ্যাতি ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তাঁর প্রেমের কবিতা কাব্যরচিত রতিশাস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বাভাবিক, অ-স্বাভাবিক, কৃত্রিম, অদ্ভুত—নরনারীর দেহসম্পর্কের যত রকম প্রকার ভেদ সম্ভবপর মার্তিয়ালিয়াসের কাব্যে তার বর্ণনা আছে। আর যাই হোক, তাকে কখনো প্রেমের কাব্য বলা চলে না। রোমান হৃদয়ের স্থূলতা এমনই দুর্মর ছিল যে তার ফলে প্রেম জান্তব আসক্তির খুব বেশি উঁচুতে কোনোদিনই উঠতে পারেনি। তবু প্রথম দিকে এই আসক্তিতেই হৃদয়ের স্পর্শ লেগেছিল এবং স্বভাবগত সারল্যও তাতে অস্পষ্ট ছিল না। কিন্তু কৃত্রিমতা ও তথাকথিত নাগরিক বিদগ্ধতার ফলে উত্তরোত্তর তা বিকৃত ও অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছিল। রোমান কবিরা সমকামকেও সমান উৎসাহে গ্রহণ করেছিলেন ; কিন্তু তাঁদের সমকামপ্রীতি ছিল অনেকখানি ফ্যাশন, গ্রীকদের অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা। গ্রীকদের মতো সেটা তাঁদের মানসিকতার বিশিষ্ট-অঙ্গ ছিল না, তাঁদের পক্ষে সেটা ছিল মানসিক বিকৃতি এবং যৌন বিকল্প মাত্র।

* *

আরবী সাহিত্যে প্রেমের কবিতার ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। মরুচারী আরব বেদুইনের জীবনে প্রেম ছিল অন্যতম অবলম্বন ও অভিজ্ঞতা, যাকে আঁকড়ে ধরে অনিশ্চিত স্বল্পস্থায়ী জীবনের সে এক নিশ্চিত অর্থ খুঁজতে চাইত, যার আস্বাদে তার দরিদ্র জীবন ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠত। মৃত্যুকে বেদুইনের ভয় ছিল না, মৃত্যুর পর কি ঘটে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল না। শত্রুর প্রতি সে ছিল নির্মম, বন্ধুর প্রতি উদার, নিজের কিংবা গোষ্ঠীর সম্মানে হেলায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত। জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটলেই তার উৎসারিত আনন্দ রূপ নিত সুরা ও সঙ্গীতে। বেদুইনের এই জটিলতাহীন মুক্ত জীবনে প্রেমের যে-ধারণা গড়ে উঠেছিল, তার প্রকৃতি যে সহজ, সরল ও বলিষ্ঠ হবে, তা অনায়াসেই অনুমান করা যায়।

প্রাচীনতম আরবী লোকগাথায় প্রেমের বর্ণনা ছিল আবশ্যিক। বাঁধাধরা

ছকে তৈরি গাথার মধ্যে অন্যবিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিকে প্রেমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেই হত এবং সর্বক্ষেত্রেই সে প্রেমপ্রসঙ্গ হত একই পরিচিত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি। গাথার বর্ণনীয় বিষয়ে শ্রোতার মন আকৃষ্ট করার এ ছিল অন্যতম উপায়। এ থেকেই বোঝা যায়, প্রেমের প্রসঙ্গে আরব বেদুইনের আগ্রহ ছিল কী অপরিসীম।

প্রাক্-ইসলামীয় যুগের আরবী কবিতায় প্রেমের তথাকথিত সূক্ষ্ম অনু-ভূতির সাক্ষাৎ মেলে না। এ প্রেমে আছে উদ্দাম আবেগের উচ্ছ্বাস এবং সেই সঙ্গে আশ্চর্য মধুর কোমলতা। আরবী কবিতায় দয়িতার রূপবর্ণনার তুলনা অন্য কোনো সাহিত্যে দুর্লভ। আরব বেদুইনের কাছে নারী উপভোগের বস্তু ছিল না, তাকে জয় করতে হত। কারণ, সমাজে নারী ছিল অধিকারে ও সম্মানে পুরুষের সমান অংশীদার। আরব নারী ছিল সত্যিকারের সহধর্মিণী। তার প্রেরণায় কবিরা গান গাইত, যোদ্ধারা নিঃসংকোচে প্রাণ দিত। ইওরোপেব মধ্যযুগের 'শিভাল্‌রি' আরবদের কাছ থেকেই ধার করা কিনা তা ভাববার বিষয়। নারীর মহত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তা বর্ণনায় কবিরা মুখর। নারী যেখানে সম্মানিত এবং অধিকারে পুরুষের সমতুল্য, সেখানেই সত্যিকারের প্রেমের জন্ম। আরবী কবিতায় তাই দেহাসক্তির প্রাবল্য নেই, দেহের প্রতি আকর্ষণ জীবনের মৌল আকর্ষণের সঙ্গেই অনুস্যূত।

খণ্ডছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত আরবদের ঐক্যবদ্ধ করে ইসলাম একদিন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইসলামের ইহলোক পরলোক ব্যাপ্ত কঠোর ও সংযমশুদ্ধ জীবনদর্শন আরব বেদুইনের সহজ সরল আদিম জীবনবোধের মূলগত কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। ধর্ম ও জীবনাচরণের কঠোরতা মেনে নিলেও আনন্দ উপভোগের সহজ প্রবণতাই তার মনের দুর্মর ধর্ম। সুরা সঙ্গীত ও প্রেম এই জন্যে আরবী কবিতা থেকে কোনোদিন পশ্চাদপসরণ করেনি।

ইসলামের প্রথম পর্ব সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল ছিল না। যুদ্ধজয়, সাম্রাজ্যবিস্তার ও গৃহযুদ্ধই সমগ্র জাতির মন আচ্ছন্ন করে ছিল। কিন্তু পরবর্তী উম্মিয়া বংশে যখন সাহিত্য সৃষ্টির সূচনা হয়, তখন দেখা যায়, তাতে

চিরাচরিত আরব মনেরই প্রকাশ। কবির মন সেই পুরনো বেদুইন জীবন চেতনাতেই আচ্ছন্ন। ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি ও নাগরিকতার প্রভাবে আরবী প্রেমের কবিতা-সঙ্গীত ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও প্রথাবদ্ধ শিল্পিতায় সুন্দর হয়ে উঠলেও বেদুইনের মনটি কখনো ঢাকা পড়েনি। জীবনের অন্যান্য অনুভূতির ক্ষেত্রে যত পরিবর্তনই ঘটুক না কেন, প্রেমের অনুভূতিতে আরব চিরকাল বেদুইন। প্রেমের কবিতার মধ্যেই আরব কবির জাতিস্মরতা।

ফারসী ও আরবী কবিতার প্রভেদ মূলগত। মনোধর্মেও এই দুই জাতির বিস্তর ব্যবধান। সভ্যতায় সংস্কৃতিতে ইরান বা পারস্য গ্রীস ও ভারতের মতোই অতি প্রাচীন। ইসলাম প্রাচীন ইরানের জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ধর্ম ও আচরণে বৃহত্তর আরব জগতের সঙ্গে সমসূত্রে গেঁথে দিলেও তার মানসিক বিশিষ্টতা লুপ্ত করতে পারেনি। মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামীয় জগতের শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ইরান চিরকালই স্বতন্ত্র। ফারসী প্রেমের কবিতা এই স্বাতন্ত্র্যের সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন।

ফারসী প্রেমের কবিতা প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক, সুফি ধর্মসাধকদের ঈশ্বর-সাযুজ্য উপলব্ধির বাঙ্ময় অভিব্যক্তি। এগুলিকে আদৌ প্রেমের কবিতা বলে গণ্য করা চলবে কিনা তা নিয়ে তর্ক ওঠা স্বাভাবিক। এই বিশিষ্ট অধ্যাত্মবাদে ভক্ত ও ভগবান, আত্মা ও পরমাত্মার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নরনারীর যৌন-সম্পর্কের রূপকের উপরে প্রতিষ্ঠিত। নরনারীর প্রেম সুফিদের কাছে ভগবৎপ্রেমের রূপক। এদিক থেকে ইরানী সুফিরা আমাদের দেশের বৈষ্ণবদের সগোত্র। তবে সুফি ও বৈষ্ণবদের রূপকে একটু পার্থক্য আছে। বৈষ্ণবের রূপকে ভগবান পুরুষ, ভক্ত নারী। সুফি রূপকে তার বিপরীত। সাকী ভগবানের রূপক। এর কারণ আর কিছুই নয়, সুরা সাকী ইরানসমেত সমগ্র আরবজগতের আসক্তি ও প্রেমের মূল প্রেরণা ও প্রতীক। সে-জগতে নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণই চিরদিনের প্রেম-কবিতার বিষয়বস্তু। সুফিরা এই পরিচিত প্রতীকই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু লৌকিক প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্ককে বৈষ্ণব ও সুফিরা যতই রূপক হিসেবে নিয়ে থাকুন না কেন, তাঁরা এটাও প্রমাণ করেছেন যে, ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক প্রেমেরই সম্পর্ক ; প্রেম-বস্তুটি রূপক নয়। সম্পূর্ণ লৌকিক প্রেমের কবিতা শুনেও তাই চৈতন্যদেব

ভাবাবিষ্ট হতেন এবং ভাবোন্মত্ত সুফি কবিরা যে কবিতা লিখতেন তা চূড়ান্ত লৌকিক প্রেমের কবিতা হয়ে উঠত।

* *

বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সাহিত্যে প্রতিফলিত প্রেমের প্রকৃতির পৃথক পৃথক আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রেম-নামক হৃদয়বৃত্তির ধারণায়, আস্বাদে ও প্রকাশভঙ্গিতে দেশ ও জাতিভেদে প্রাচীন মানসিকতায় কত তারতম্য, কত প্রকারভেদ। সমকালীনতা যে বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানসিকতার মিল ঘটায়, এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা। জীবনযাপন পদ্ধতি, সমাজ ও সভ্যতার মিলই ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার মিল ঘটায়; কালের ভূমিকা একেবারেই নিষ্ক্রিয়। প্রত্যেক জাতির সভ্যতার প্রকৃতির মধ্যেই প্রকার-ভেদের কারণগুলি নিহিত। আবার অন্যদিকে এটাও বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রাচীন মনের সঙ্গে প্রেমের আস্বাদে আধুনিক মনেরও কতখানি মিল। এই মিলের কারণ কি তাও আমরা বুঝতে পারি। সমাজ ও সভ্যতা যত পরিবর্তিতই হোক, এক যুগের মানুষ অন্য যুগের কাছে যত অপরিচিতই হয়ে উঠুক, এই একটিমাত্র হৃদয়বৃত্তির মাধ্যমেই এক যুগের মানুষ অন্য যুগের সঙ্গে কত সহজে পরিচিত হতে পারে; কালের ভূমিকা এখানেও নিষ্ক্রিয়। রক্তমাংস ও সংবেদনশীল মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এর কারণ নিহিত। একথা জোর করেই বলা যায় যে, বহু পার্থক্য সত্ত্বেও আধুনিক মানুষের মন প্রেমের অনুভূতি, আবেগ ও প্রকাশভঙ্গিতে প্রাচীন মন থেকে খুব বেশি পৃথক হতে পারেনি। মানুষের সকল হৃদয়বৃত্তিই চিরকাল ধরে সংস্কৃত হয়ে চলেছে। কিন্তু সংস্কৃত হতে হতে অনেক হৃদয়বৃত্তির ক্ষেত্রে যতখানি পরিবর্তন ঘটে গেছে, মানুষের আদিমতম জৈববৃত্তির ক্রমসংস্কৃত রূপ প্রেমের ক্ষেত্রে ততখানি ঘটেনি; ঘটা সম্ভবও নয়। একমাত্র এই হৃদয়বৃত্তিটিই মহাকালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে মানুষের মনে যুগ থেকে যুগান্তরের সেতু বেঁধে দিতে পেরেছে।

অবন্তী সান্যাল

সংকলন প্রসঙ্গে :

পৃথিবীর যে-সাহিত্যগুলি তর্কাতীতভাবে প্রাচীন কেবলমাত্র সেগুলিকেই এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তামিল সাহিত্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে সংকলন পূর্ণাঙ্গ হত। কিন্তু অনিবার্য কারণে তা সম্ভবপর হয়ে উঠল না। সেজন্যে আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

খাঁটি লিরিক ছাড়া অন্য কোনো ধরনের কবিতা নির্বাচন করা হয়নি। কবিতাগুলিকে যতদূর সম্ভব কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। তবে সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত এবং জাপানী অংশে বিশেষ কারণে কালানুক্রম যথাযথ রক্ষা করা যায়নি।

বাংলা সাহিত্যের অগ্রজ কবিদের অনূদিত প্রকাশিত কবিতা যতদূর সম্ভব এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা হয়েছে। হেমেন্দ্রলাল রায়ের কোনো কবিতা সংকলনে স্থান পায়নি, তার কারণ, বহু চেষ্টা করেও তাঁর মণিদীপা গ্রন্থ সংগ্রহ করা যায়নি। অন্য একজন কবির ক্ষেত্রে প্রকাশকের অনুমতি মেলেনি। অগ্রজ কবিদের কবিতা সংগ্রহ করতে গিয়ে সবচেয়ে বিস্ময় বোধ করেছি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদের পরিমাণ দেখে। হিব্রু ছাড়া অন্য সমস্ত অংশেই তাঁর কবিতা স্থান পেয়েছে এবং সংকলনে তাঁর কবিতার সংখ্যা কম নয়। সংকলনটি তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশে পরম শ্রদ্ধায় উৎসর্গ করা হল।

প্রচুর কবিতা কেবলমাত্র এই সংকলনের জন্যেই অনুবাদ করানো হয়েছে। যাঁরা অনুবাদ করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ খ্যাতিসম্পন্ন কবি। সুতরাং অনুবাদের সার্থকতা ও ব্যর্থতার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাঁদেরই। জয়দেবের পদটি অনুবাদ না করে মূল সংস্কৃতই রাখা হয়েছে। জয়দেবের ভাষাকে অনুবাদ করা অসম্ভব। বাঙালীর কাছে তাঁর ভাষা রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে কোনো কালেই বাধা হয়ে দেখা দেয়নি।

শক্তিমান তরুণ শিল্পী পূর্ণেন্দুশেখর পত্রীকে সংকলনের অঙ্গসজ্জার জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। তাঁর আঁকা অসংখ্য ছবিগুলি দেশবিদেশের প্রাচীন স্থাপত্য ও চিত্র থেকে সংগৃহীত। অনিলকুমার সিংহ সংকলনটিকে শোভন, সুন্দর ও রুচিসম্মত করে তুলতে কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করেননি। এ ব্যাপারে

মুদ্রালয়ের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতাও মিলেছে। তবু মুদ্রণত্রুটি থেকে রেহাই পাওয়া যায়নি। মারাত্মক ত্রুটি ঘটে গিয়েছে শীলা ভট্টাচারিকার অমর কবিতাটিতে। কবিতাটির প্রথম লাইন হবে: 'কৌমার মোর হরেছিল যেই, সেই বর, সেই চৈত্ররাতি'। এই ত্রুটির জন্যে প্রকাশক ও সম্পাদক অত্যন্ত দুঃখিত।

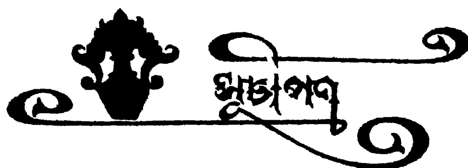
এই সংকলনের প্রথম পরিকল্পনা সম্পাদকের সতীর্থ ও আকৈশোর বন্ধু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের। সংকলনের কাজে সম্পাদক সবচেয়ে ঋণী অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী ও কানাই সামন্তের কাছে। এঁদের দুজনের সক্রিয় সহযোগিতা, উৎসাহ ও উপদেশ না পেলে সম্পাদকের পক্ষে এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা খুবই কঠিন হত।

সংকলনের ব্যাপারে সম্পাদকের সঙ্গে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হয়েছে দীপ্তি সান্যাল, অজিত সান্যাল, সহকর্মী বন্ধু হরশঙ্কর ভট্টাচার্য, সুরেশচন্দ্র সরকার ও নির্মাল্য আচার্যকে। এঁদের কাছে সম্পাদকের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা প্রকাশের অনুমতি মিলেছে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ ও কনকলতা দত্ত মহাশয়ার সৌজন্যে।

এই ধরনের অভিনব সংকলনে ত্রুটিবিচ্যুতি অনিবার্য। আশা করি, সহৃদয় পাঠকেরা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলি মার্জনা করবেন। পরবর্তী সংস্করণে সমস্ত কিছু সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া রইল।

অ. সা.



সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত

মিসরীয়

হিব্রু

চীনা

গ্রীক

লাতিন

আরবী

জাপানী

ফারসী

• সংস্কৃত • পালি • প্রাকৃত





'ঋগ্বেদ' থেকে

লোপামুদ্রা ॥ আক্ষেপ

দিবস-রজনী শ্রান্ত আমারে দীর্ঘ বরষ জীর্ণ করে,
প্রতি উষা হরে কায়ার কান্তি,
—আসুক পুরুষ নারীর তরে। ১

দেব-সম্ভাষী সত্যপালক পূর্ব ঋষিরা, তাদের ঘরে
ছিল জায়া, তবু ছিল তপস্যা,
—যাক্ নারী আজ পুরুষ তরে। ২

পুরুরবা ও উর্বশী ॥ সংবাদ

পুরুরবা ঃ

উভয়েরি আছে দরকারী কথা, নিঠুর চিত্ত কেন গো প্রিয়া।
এখন যদি না খুলে বলি, পরে যাবে মন মাঝে দুঃখ দিয়া ॥ ১

উর্বশী ঃ

তোমা সাথে আর কথা বলি মোর লাভ কি হইবে, বলো,
তব গৃহ হতে চলি গেনু যেন প্রথম ঊষার আলো।
পুরুরবা, তুমি যাও, চলি যাও আপনার গৃহ 'পরে
বায়ুর মতন কভু না আমারে রাখিতে পারিবে ধরে ॥ ২

পুরুরবা ঃ

জয়লাভ তরে বাণ নাহি চলে আমার তূণীর হতে
আনিতে পারি না শত শত ধেনু আমার বিজয় পথে।
কার্যে আমার উৎসাহ নাই, কোনো শোভা নাই দেশে,
সিংহনাদের চিন্তা ছেড়েছে সৈন্যেরা পরিশেষে ॥ ৩

ঊষাদেবি, মোরে বাসিলে সে ভালো আপনি ভূষিত দেহে,
পাশে ঘর হতে অন্ন আনিয়া শ্বশুরেরে দিত স্নেহে।
ঘরে চলি যেত চুপি চুপি, আর কি বলিব ? সেথা গিয়া
দিবস রজনী বেতসের মতো রহিত সে জড়াইয়া ॥ ৪

উর্বশী ঃ

দিনে তিনবার করিতে তুমি তো আমারে আলিঙ্গন,
অবাধে তুমি যে কত সুখ দিতে তা জানে আমার মন।
পুরুরবা, আমি তব গৃহ নাহি ছাড়ি যাইতাম কভু,
হে বীর, তখন ছিলে যে আমার সকল দেহের প্রভু ॥ ৫

পুরুরবা ঃ

সুজূর্ণি আদি আগে যারা ছিল আমাব সেবার তরে
ভূষিত হইয়া আর আসিত না, তুমি আসিবার পরে।
গাভীগণ যবে গৃহে ফিরে যায় শব্দ করিয়া সুখে
তেমন ধ্বনি তো কভু শুনি নাই আর তাহাদের মুখে ॥ ৬

উর্বশী ঃ

তোমার জন্মে অভিনন্দনে করিলেন আগমন
স্ববেগবাহিনী নদীদের সহ স্বর্গের দেবীগণ।
মহৎ যে রণে দস্যু বধিতে দেবতারা সবে আসি
সংবর্ধনা করিল তোমায় মহা-আনন্দে ভাসি ॥ ৭



পুরুরবা ঃ

হরিণী যেমন ভয়ভীত চিতে পালায় সুদূর বনে
অথবা যেমন রথের অশ্ব ছোটে আপনার মনে।
তেমনি ছুটিল নানা রূপ ধরি পাছে পড়ি যায় ধরা
নর পুরুরবা হলে আগুয়ান্ অমানুষী অপ্সরা ॥ ৮

উর্বশী ঃ

নর পুরুরবা পরশিতে তবু চাহে সুরনারী দেহ,
কহিল না কথা স্বর্গবাসিনী অপ্সরাগণ কেহ

নাহি দেখাইল নিজরূপ তারা লুকাল শঙ্কাভরে
ক্রীড়াপরায়ণ অশ্ব যেমন বেগে পলায়ন করে ॥ ৯

আকাশ হইতে ছুটি পড়ে যেন উজল তড়িৎ রেখা
মোর অভিলাষ পূর্ণ করিতে উর্বশী দিল দেখা।
সফল করিল কামনা, গর্ভে ধরি নর-সন্তান ;
উর্বশী সেই পুত্রে দীর্ঘ জীবন করুন দান ॥ ১০

উর্বশী ঃ

রাজ্য পালিতে পুত্র চেয়েছ, চাহনি তো তুমি মোরে
আমার গর্ভে রেত নিষেকিয়া লভেছ পুত্রবরে।
জানিতাম কিসে হইবে বিরহ ; বলিয়াছি কত বার,
শোনোনি তা ; এবে দেশ ছাড়ি বৃথা বিলাপে কি হবে আর ? ১১

পুরুরবা ঃ

কবে তব সূত হইবে যোগ্য ? আমারে করিবে সুখী ?
একটু বুঝিলে কাঁদিবে নিয়ত হৃদয়ে গভীর দুখী।
প্রেমপরায়ণ কোন্ নরনারী বিরহের ভার চাহে ?
শ্বশুরের কুল কেন তবে জ্বালো দারুণ অগ্নিদাহে ? ১২

আমি বলি শোনো, পুত্র নহে গো করিবে অশ্রুপাত ;
কাঁদিবে না ; তার মঙ্গল তরে জাগি রব দিনরাত।
মম গর্ভজ পুত্রে তোমার পাঠাইয়া দিব, শুন,
ঘরে যাও, তাকে পাবে তুমি, সখা, মোরে না পাইবে পুনঃ ॥ ১৩

পুরুরবা ঃ

প্রেমিক তোমার যাক্, মরে যাক্, আর যেন নাহি ওঠে ;
পরলোকে দূরে আরো আরো দূরে সে যেন নিয়ত ছোটে।

মৃত্যুর কোলে পড়ুক ঢলিয়া, শুয়ে থাক্ ভূমি ’পরে,
বলবান্ সব বৃক আসি যেন তারে ভক্ষণ করে ॥ ১৪

উর্বশী ঃ

ছি, ছি, পুরুরবা, আত্মহত্যা কোবো না, পড়ো না দুখে ;
দুষ্টপ্রকৃতি বৃকেরা যেন না ভুঞ্জে তোমারে সুখে।
নারীর হৃদয়ে যথার্থ প্রেম নাই নাই কিছু নাই
এ যে ঘরে পোষা বৃকের পরাণ নাইক প্রেমেব ঠাঁই ॥ ১৫

নিজরূপ ছাড়ি অন্য আকারে ছিলাম মর্ত্যলোকে
দীর্ঘ চারিটি বৎসর আমি রাত্রি যাপিনু সুখে।
ছিলাম ভালোই, দিনে একবার খাইয়া একটু ঘি,
তাতেই আমার বেশ চলে যেত বেশি আর লাগে কি ? ১৬

পুরুরবা ঃ

আমি হেথা চাই আসনে বসিয়া কবিতে আলিঙ্গন
গগন ভরি যে রহে উর্বশী স্বর্গের প্রাণধন।
দৈবশক্তি আছে যে তোমার, তোমারি পুণ্যবলে
ফিরে এসো, ওগো উর্বশী, হের হৃদয় আমার জ্বলে ॥ ১৭

উর্বশী ঃ

ইলানন্দন, ওই দেবগণ বলিছেন তোমা ডাকি—
মরণবিজয়ী হবে তুমি এই মর্ত্যভুবনে থাকি।
সন্তান তব যজ্ঞ করিয়া তুষিবে অমরচয়
ওহে পুরুরবা, স্বর্গে তুমিও রবে আনন্দময় ॥ ১৮

'অথর্ব বেদ' থেকে

*** * * ॥ বশীকরণ**

(নারীকে পুরুষ)

চিত্তমথন মন্মথ যেন প্রণয়ে পাগল করে ;
হৃদয় তোমার বিদ্ধ করি এ-তীক্ষ্ণ কামের শরে
প্রেমেভরা যেই-শর চলে শুধু আগ্রহ পাখা লয়ে
ছাড়ানো না যায় তীক্ষ্ণ যে শেল, বিঁধে যেন ও-হৃদয়ে।
লক্ষ্য-না-হারা সেই বাণে কাম বিঁধুক তোমার বুকে ;
কামনাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া শুষ্ক তপ্ত মুখে
ক্ষণভঙ্গুর গর্ব ও মান সবাইয়া রাখি দূরে
এসো এসো প্রাণ-প্রেয়সী আমার, গাহ মিলনের সুরে ;
আমারি—তুমি যে আমারি সে কথা প্রমাণ করিয়া দাও,
মধুর বচনে মোর তরে তব পীরিতির গান গাও।



*** * * ॥ বশীকরণ**

(পুরুষকে নারী)

মাতাও, মাতাও, বায়ু তার মন ; মাতাও মাতাও, মরুদ্‌গণ ;
অগ্নি, আমার প্রণয়ে তাহার চিত্ত করো গো উচ্চাটন ;
আপাদ-শীর্ষ আমার বিরহে অস্থির যেন সদা সে রয় ;
হে দেবতা, দাও বিরহ তাহারে ; মোর প্রেমে যেন লভে সে লয়

'দীঘ নিকায়' থেকে

* * * ॥ পঞ্চশিখ গন্ধর্বের গান

প্রণাম সে তিম্বরুকে, হে কল্যাণী, হে সূর্যবর্চসা,
জনক যিনি তোমার—আমার আনন্দদায়িনীর ॥

ঘর্মাক্ত যেমন চায় হাওয়াকে, যেমন পিপাসিত
চায় জল, তেমনই আমার প্রিয় তুমি, জ্যোতির্ময়ী,
সদ্ধর্ম যেমন প্রিয় অর্হতের ॥



ব্যাধির আগুনে
শান্তি আনে যেমন ঔষধ, ক্ষুধার আগুনে খাদ্য,
শান্ত করো, শান্ত করো তেমনই এ দাহন আমার
প্রেমাভিসিঞ্চনে তুমি ॥

সুখশীত, পরাগসুরভি,
বিকীর্ণপলাশ তুমি যেন এক কমল-সরসী ;
তাপদগ্ধ নাগ আমি লীন হবো উরসে তোমার ॥ ...

অঙ্কুশে মানে না বশ, মানে না যে তোত্র বা তোমর
এ চিত্ত সে মদহস্তী ; অসংবিৎ সৌন্দর্যে তোমার
জানে না সে কি করে কখন। দিগ্‌ভ্রান্ত আমার মন
বদ্ধ হল তোমাতেই। বড়িশ গিলেছে যে-রোহিত
তারই মতো নিজেকে সে পারে না ছাড়াতে। হে সুন্দরী,
হে শান্ত প্রেক্ষণা, দাও আলিঙ্গন, দাও, দাও
আলিঙ্গন, পূর্ণ করো এ প্রার্থনা ॥

হে কুঞ্চিতকেশী,
অতি দীন বাসনা আমার ধরেছে পুঞ্জিতরূপ
অর্হতের দক্ষিণার মতো। তাঁদেরই সেবায় আমি
যে পুণ্য করেছি, সে পুণ্যের, সর্বাঙ্গকল্যাণী অয়ি,
তুমি হও পরিণত ফল। এ মর্ত্য সংসারে আমি
যদি কিছু পুণ্য করে থাকি, সর্বাঙ্গকল্যাণী অয়ি,
তুমি হও তারই পুরস্কার ॥

ধ্যানলীন, আনন্দিত
শাক্যমুনি বিস্মৃতিবিহীন ; জাগরূক প্রজ্ঞা তাঁর
অমৃতসন্ধানী। মহামুনি পাবেন সম্বোধিরত্ন
আনন্দপ্রোজ্জ্বল। আমিও তোমাকে পেয়ে, হে কল্যাণী,
পাবো দীপ্ত আনন্দ-বিহার।
শক্র ত্রায়স্ত্রিংশপতি
যদি দেন বর, শুধু তোমাকেই চাবো তাঁর কাছে—
আমার এ ভালবাসা, হে কল্যাণী, এমনই গভীর ॥

কুসুমিত সালতরুনিভ সেই তিম্বরুকে করি
প্রণিপাত, হে সুমেধা, পিতা যিনি এমন কন্যার ॥

'রঘুবংশ' থেকে

কালিদাস ॥ অজ-বিলাপ

নাই আর তব কণ্ঠে বাণী
অবিন্যস্ত স্রস্ত অলকে আধ-ঢাকা তব বদনখানি,
গুঞ্জনহীন ভ্রমর-গর্ভ নিশীথে মুদিত কমলসম
ও মুখের ছবি মর্মে আমার
জাগায় বেদনা তীব্রতম।

চাঁদ ডুবে গেলে বিরহিনী নিশা
আবার চাঁদেরে ফিরিয়া পায়।
নিশীথে হারায় চখী যে চখায়
ফিরে পায় প্রাতে আবার তায়।

কোনো মতে তারা বিরহ সয়,
চিরতরে গেলে, তাই তিলে তিলে
তব বিচ্ছেদ দহে হৃদয়।

বিস-কিশলয়ে রচিত শয়নে
ও দেহলতায় দিত যে ব্যথা,
কেমনে সহিবে দারুণ বেদনা
হয়ে আজি চিতা-শয্যাগতা ?

তোমার সঙ্গে নির্জনে যত বিহারকলা
সাক্ষিনী তার রঙ্গিনী তার—সঙ্গিনী তার এই মেখলা।
নিক্কণহীন রয়েছে পড়ি,
সহমৃতা হল সেও কি দুঃখে ? হা সুন্দরী !

বিদায়ের কালে ভাবিয়াছিলে,
দয়িত তোমার সহিতে নারিবে
বিরহ সে-কথা, হে শুচিশীলে !
তাই বুঝি প্রিয়ে রেখে গেছ তব
বিলোল দৃষ্টি—মৃগীর চোখে,
রাজহংসীতে মদালস গতি
লুলিত লতায় লীলা-বিলাস,
হায় সখি হায় বৃথা প্রয়াস !
তারা যে তোমার স্মৃতিটি বহে
বিরহ আগুনে আমার হৃদয় দ্বিগুণ দহে।

* * *

ঋতুতে ঋতুতে উৎসব নব নবায়মান
আর জানিবে না, জীবনের মোর ফুরাল গান,
বিলাস বেশের কোনো প্রয়োজন আর না হবে,
তোমার ললিত তনুবিদলিত শূন্য শয্যা পড়িয়া রবে।
সংসারে মোর ছিলে যে গৃহিণী বংশধরের জন্ম দিলে।
মন্ত্রণা দিতে সচিব হইয়া কলাবিদ্যায় শিষ্যা ছিলে।
কি না ছিলে তুমি বুঝায়ে বলিতে হইবে তা কি ?
তোমারে হরিয়া অকরুণ কাল
কি আর হরিতে রাখিল বাকি।
মদিরলোচনে এতদিন মম
পীতাবশিষ্ট মদিরা প্রিয়া
পরলোকে প্রিয়ে সহসা গিয়া
কেমনে অশ্রুবারি-মিশ্রিত আমার দান
তর্পণাম্বু করিবে পান ?

'মেঘদূত' থেকে

যক্ষের উক্তি

তন্বী শ্যামা বিম্বাধরা শিখরিদশনা
ক্ষীণকটি নিম্ননাভি উচ্চকিত হরিণীনয়না
স্তনভারানম্রতনু শ্রোণীভারে মন্থর চরণা
বিধাতার আদিশিল্প—নিরুপমা রমণীরচনা !
হেন নারী যদি সেথা থাকে,
আমার দ্বিতীয় সত্তা বলি. মেঘ, জানিয়ো তাহাকে ॥

আমার দ্বিতীয় সত্তা মিতবাক্ প্রিয়তমা মম ;
আমি কতো দূরে, সে যে নিঃসঙ্গিনী চক্রবাকীসম।
বিরহবিধুর দিন, প্রিয়ার উৎকণ্ঠা সীমাহারা—
তাহারে দেখিবে, মেঘ, হেমন্তের পদ্মিনীর পারা ॥

ফুলেছে আখির পাতা ক্রন্দনে ক্রন্দনে নিরন্তর ;
নিঃসহ নিশ্বাসতাপে পাণ্ডুর প্রিয়ার ওষ্ঠাধর ;
লম্বিত অলকপুঞ্জে করে ন্যস্ত শ্রীমুখ সুন্দর
তোমারি ছায়ায় যেন ক্ষীণকান্তি দীন সুধাকর ॥

হয়তো দেখিবে, মেঘ, প্রিয়া মোর রত দেবার্চনে,
অথবা বিরহে ক্ষীণ মোর কল্প-চিত্র-বিরচনে,
কিংবা সে কহিছে তার, মঞ্জুলভাষিণী সারিকারে—
"তুইও তো প্রিয়া তার, কভু, সখি, স্মরিস কি তারে ?"

হয়তো উৎসঙ্গে বীণা রাখি প্রিয়া মলিনবসনা
মম নামাঙ্কিত গান উচ্চকণ্ঠে চাহে গাহিবারে,
নয়ন-সলিলে সিক্ত তন্তু তার করিয়া মার্জনা
আপন মূর্ছনা প্রিয়া ভুলে ভুলে যায় বাঁরে বারে ॥

নিদ্রাসুখনিমগনা যদি, মেঘ, দেখ প্রেয়সীরে
নিশীথে, প্রহরকাল কণ্ঠ র'ধি রহিয়ো বাহিরে—
হয়তো তখনি মোরে স্বপ্নে লভি বাঁধিয়াছে প্রিয়া
গাঢ়গূঢ় আলিঙ্গনে, স্বপ্ন যেন না যায় টুটিয়া ॥

সুপ্তি ভঙ্গে প্রেয়সীরে
তব জলকণাস্নিগ্ধ যূথীগন্ধনন্দিত সমীরে
যতনে প্রশান্ত করি বোলো, 'হে সুন্দরী,
তব দয়িতের বাণী আনিয়াছি মোর কণ্ঠে ভরি
আমি মেঘ প্রিয়সখা তার
লোভাতুর যে তোমার
শ্রীমুখের স্পর্শসুধাপানে
সামান্য কথাটি তাও বলিত তোমার কানে কানে,
সেই প্রিয়তম তবু মম রসনায়
মর্মবাণী তোমারে শুনায় ॥'

নিরখি তোমার, প্রিয়া, তনুখানি প্রিয়ঙ্গু-লতায়,
দৃষ্টি তব চমকিত হরিণীর আঁখি-ভঙ্গিমায়,
শশাঙ্কে কপোল ছায়া, শিখি-পুচ্ছে তব কেশপাশ,
তটিনীর ঊর্মিমাঝে নেহারি তোমার ভ্রূ-বিলাস,—

হায় বিশ্বে হেন বস্তু নাই
সমগ্র তোমারে যেথা একাধারে দেখিবারে পাই!

মর্মরে গৈরিকে রচি মানিনী মূরতি তব, রানি,
তাহারি চরণ-প্রান্তে পতিত আমার মূর্তিখানি
যখনি আঁকিতে চাই, এ নয়নে নিমেষে ঘনায়
নিবিড় অশ্রুর মেঘ, দৃষ্টি মোর লুপ্ত হয়ে যায়—
চিত্রপটে মিলন দোঁহার,
তাও নাহি সয়, প্রিয়া, হিংসায় নিষ্ঠুর বিধাতার!
বাহু প্রসারিনু, প্রিয়া, দয়াহীন আলিঙ্গনপাশে
তোমারে বাঁধিতে বক্ষে—স্বপ্ন! হায়, বাহু শূন্যে ভাসে!
নিষ্ফল আমারে হেরি অশ্রুবিন্দু বনদেবতার
ঝরিল মুকুতাসম কিশলয়ে তরুলতিকার॥

দেবদারু বিটপীর তরুণপল্লব ছিন্ন করি
তার ক্ষীরস্রুতিগন্ধে আপনার স্নিগ্ধ তনু ভরি
দক্ষিণ সরণি বাহি আসে যবে হিমাদ্রিপবন,
তারে আমি করি আশ্লেষণ—
ভাবি সে এনেছে বুঝি আপন তনুতে
হে প্রিয়া, তোমার স্পর্শ মিশাইয়া অণুতে অণুতে॥

হংসপদিকার গান

নবমধুলোভী ওগো মধুকর,
চূতমঞ্জরী চুমি,
কমল নিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ
কেমনে ভুলিলে তুমি ?



ভবভূতি ॥ একা

একাকী যদি কাটিল কাল, বাঁচিয়া সুখ নাই ;
শোভার নিধি কি হবে ?—যদি ভাবুক নাহি পাই
যে দিন দেখা না পাই তব সে দিন হোক নাশ,
তোমায় ছেড়ে সুখের আশা মরীচিকার আশ।

প্রিয়ার পরশ

সরস পরশে তব ইন্দ্রিয়ের উপজে বিকার
ও পরশ চেতনারে ভ্রান্ত করি চিয়ায় আবার।
নিশ্চয় করিতে নারি,—হর্ষ ইহা কিংবা দুঃখভার,
মোহ—নিদ্রা,—মত্ততা কি সুধাসেক,—বিষের সঞ্চার



শ্রীহর্ষ ॥ প্রেমসংকট

দুর্লভজনে অনুরাগ মম, হায়,
লজ্জা বিষম, আমি পরবশ তায় ;
একি সংকট, সখী, একি হল দায়,
মরণই শরণ, নিরুপায় নিরুপায়।

অমরু ॥ * * *

এক

বিজনে মোরে ডাকিল প্রিয়—গোপন কথা আছে ;
কৌতূহলে কাননতলে বসিনু তার কাছে।
কি কথা যেন কহিতে গিয়া আমাব কানে কানে
আমার মুখ সুরভি আঘ্রাণে
চকিতে প্রিয়তম
রভসভরে ধরিল, সখী, কবরীখানি মম !
আমি কি করিলাম ?
অধবে মোর অধর তার চাপিয়া ধরিলাম ॥

দুই

ধরেনি আমার বসন-প্রান্ত,
বাহুলতা মেলি বন্ধ করেনি দ্বার ;
চরণে আমার লুটায়ে পড়েনি
'যেয়ো নাকো, প্রিয়,' বলেনি একটিবার ;
প্রথম আষাঢ়, আমি চলে যাবো,
অম্বরতলে কজ্জল মেঘভার,
যাওয়া হল নাকো—প্রিয়ার অশ্রু-
রচিত তটিনী কেমনে হইব পাব।

তিন

সমুখে আসি প্রেমের বাণী শোনায় যবে প্রিয়,
বুঝিতে নারি তখন মোর নিখিল ইন্দ্রিয়
নয়ান হয়ে বয়ানখানি নিরখে বঁধুয়ার
কিংবা শোনে শ্রবণ হয়ে মোহন ঝংকার।

চার

শয্যায় মোর এল যবে প্রিয়তম,
নীবীবন্ধন আপনি খসিল মম ;
নিতম্বতটে লুটালো শিথিল শাড়ি ;
এইটুকু শুধু স্মরণ করিতে পারি।
তারপরে হায় সে যে কে, আমি কি, লীলা সে কেমনধারা,
কিছু মনে নাই, বিস্মরণীর অতলে হয়েছে হারা॥



পাঁচ

সখীরা আমায় বলে চলে গেল —
'ঘুমায়ে পড়েছে, তুইও ঘুমা।'
আমি ধীরে ধীরে বঁধুর অধরে
আবেশে আঁকিনু গোপন চুমা ;
সহসা নিরখি রোমাঞ্চ তার
ফুটিয়া উঠেছে দেহের তলে—
কপট বন্ধ নয়ন দুখানি
মুদে আছে তবে ঘুমের ছলে !

লাজে মরে যাই কি আর বলিব
প্রিয়তম মম অতুলনীয়—
যখন—যেমন—তখন—তেমন
বিধিমতে লাজ হরিল প্রিয় ॥

ছয়

স্তনপট হতে চন্দন-লেখা নিঃশেষে মুছে গেছে ;
অধরতলের তাম্বুল রাগ ঘুচে গেছে ;
নীল অঞ্জন গলে গেছে, সখী, প্রস্বেদকণা জাগে দেহে,
রোমাঞ্চময় শিহর এখনো লাগে দেহে ;—
মিথ্যাবাদিনী, স্নানে গিয়েছিলি ? নদীজলে সব ধুয়ে এলি
আমি কি জানি না প্রসাধন যতো কাহার অঙ্গে থুয়ে এলি

সাত

কপোল রেখেছ কমনীয় করতলে
সেইটুকু শুধু মুছে গেছে চারু চন্দন !
অমৃত মধুর সরস ওষ্ঠে বুঝি
পীতাভা দিয়েছে নিশ্বাসে হৃদস্পন্দন্ !
অঝোরে অশ্রু ঝরেছে কণ্ঠ বেয়ে
বারবার কাঁপে স্তনচূড়া, কাঁপে দেহ ;
অয়ি অনুনয়-বিরূপে, বুঝেছি আজ
ক্রোধই তোমার প্রিয়, আমি নই কেহ !

আট

মিলনে সে আনে ঈর্ষার জ্বালা, বিরহে দহন করে ;
স্পর্শনে করে অবশ এ তনু, দর্শনে প্রাণ হরে ;
পেলেও তাহারে নাহি সুখ, আর গেলেও সে নাই সুখ,—
এ কি বিচিত্র বল্লভ মোর ভরে আছে সারা বুক !

নয়

সে আজ বিরহী-মোর গৃহে, সে যে দিকে দিগন্তরে,
সে মোর সমুখে, মোর পিছনে সে, সে যে শয্যা 'পরে,
সে আমার পথে পথে, সে আমার নিখিল ভুবনে,
আব মোব কেহ নাই, কিছু নাই আমার জীবনে,
শুধু সে, শুধু সে, সে, সে, সে ছাড়া অস্তিত্ব আর নাই—
এ কোন্ অদ্বৈতবাদ ? কে বলিবে, কাহাবে শুধাই ?



ভর্তৃহরি ॥ * * *

এক

অয়ি নবযৌবনা
তোমার নিন্দা করি পণ্ডিত জনা
আপনারে করে প্রতারণা আর অন্যে প্রবঞ্চনা।
সব সত্যের সার—
তপস্যাফল স্বর্গ, আবার স্বর্গের ফল সুধারস শৃঙ্গার ॥

দুই

মাথায় আমার মল্লীমালার বিচিত্র বন্ধন,
অঙ্গে আমার অনুলেপন কুঙ্কুম চন্দন,
লুটায় প্রিয়ার বক্ষখানি আমার বুকের 'পরে—
স্বর্গ সে আজ স্বর্গে তো নাই, আমার মাটির ঘরে ॥

তিন

সেই দীপাবলী, সেই সে বহ্নি
তেমনি রয়েছে শ্যামগেহে বসুধার ;
জ্বলিছে সূর্য গগনের বুকে,
কণ্ঠে দুলিছে চন্দ্রতারার হার ;
তবু বিধাতার নিখিল সৃষ্টি অতল তিমিরে লীনা—
অপ্রসন্ন আমার প্রিয়ার আঁখির প্রসাদ বিনা ॥

চার

ভ্রূকুটি-কুঞ্চিত দুটি নয়নের অপাঙ্গ ভঙ্গিমা,
লাজবিজড়িত হাসি অধরে, কপোলে অরুণিমা,

বাণীর বিলাস অভিনব,
ছন্দে ছন্দে গতি লীলা, অবস্থিতি সেও লীলা তব,—
অয়ি প্রিয়া, এ তোমার অপূর্ব ভূষণ,
এ তোমার, হে রঙ্গিনি, খরশান আয়ুধ ভীষণ।

পাঁচ

প্রিয়ার অদর্শনে,
আর কিছু নয় শুধু দেখা দিক—একটি কামনা মনে
মিলে যবে দরশন,
পরিষ্বঙ্গবসতৃষাতুর হয়ে ওঠে প্রাণ মন।
প্রেয়সীরে যবে বাঁধি বাহুপাশে, অন্তরাত্মা বলে,—
দুই কেন আর? দ্বৈত এবার
লীন হয়ে যাক অদ্বৈতের তলে॥

ধর্মকীর্তি * * *

বুঝি না—এ হেন রূপটি স্রষ্টা নয়ন মেলিয়া কেমনে গড়ে;
নয়নে পড়িলে, মুগ্ধ বিধাতা ছাড়িত কি তারে ক্ষণেক তরে?
নিমীলিত-চোখে এ রূপ-সৃষ্টি সম্ভব নহে; বুঝেছি তাই—
বুদ্ধের এই কথাটি সত্য—জগতের কোনো স্রষ্টা নাই!

মধুকূট * * *

স্বপ্নে দেখিনু উদ্যান-গৃহে যেন অশোকের 'পরে
লাক্ষা-অরুণ স-নূপুর পদ ফেলিনু দোহদ-তরে,—
কি বলিব, সখি, নিকুঞ্জ হতে কখন্ আসিয়া ধীরে
ধূর্ত সহসা সে-পায়ের মান রাখিল আপন শিরে!..

অজ্ঞাত ॥ * * *

কাল যে-কণ্ঠে চলেছিল মোর বাণীর মহোৎসব—
অয়ি প্রিয়া ! অয়ি মানসী ! কান্তা ! নিরুপমা ! মধুময়ী !
সে-কণ্ঠে শুধু ধূসর গদ্য 'ওগো, হ্যাগো' আজ জয়ী—
এই তো জীবন ; স্বপ্ন, কবিতা নিছক মিথ্যা সব।

বিজ্জকা ॥ * * *

এক

গেছে সদ্ভাব, সে প্রেমবন্ধ, প্রণয়ের বহুমান,—
সে জন সমুখে চলে যায়, তার অচেনাব মতো ভান ;
ভাবিয়া ভাবিয়া এই কথা আর গত দিবসের সুখ,
বুঝিতে পারি না আজো কেন, সখি, শতধা ভাঙে না বুক !

দুই

ধন্য তোমরা সখি, তোমাদের এত কথা থাকে মনে—
পটু চাটু যত, নর্মবিলাস হয়েছে যা প্রিয় সনে ;
কটিবসনের বন্ধন যবে টুটাল সে প্রিয়-কর—
শপথ আমার, সখি, যদি কিছু মনে থাকে তারপর !

তিন

হে প্রাণবন্ধু, ফিরিতে তোমার কতদিন আর রয়েছে বাকি ?
চাঁদেরো কিরণ দহন করিছে—এই পোড়া দেশে কেমনে থাকি ?

বিকটনিতম্বা ॥ * * *

ত্রিকোণ পৃথিবী, তার-অর্ধেক রহে জুড়ে নগ-নদী,
অর্ধেক তার নারী আর শিশু যোগী আর রোগী যদি,
থাকে কয়জন, তা হতে মান্য ছাড়ি গুরুজন সব ?
মিছে অপবাদ—'অসতী অসতী' মুখর এ মুখ-রব।

ভাবক দেবী * * *

এক

আগে সে মোদের ছিল এক দেহ, ছিল না তো ছাড়াছাড়ি,—
তারপর তুমি নহ আর প্রিয়, আমি আশা-হত নারী।
এখন আমি যে শুধুই গৃহিণী, তুমি শুধু মোর স্বামী,—
প্রাণ ছিল মোর কুলিশ-কঠিন, তারি ফল লভি আমি !

দুই

স্বামীরা স্বাধীন, তবে কেন মিছে লুটিছ আসিয়া আমার পায় ?
মন বসেছিল অন্য কোথাও, কিছুদিন তরে ?— কি দোষ তায় ?
পতির বিহনে সতী নাহি বাঁচে, এই কথা আজো সকলে কহে—
আমি বেঁচে আছি তোমার বিরহে,—দোষ তো আমার, তোমার নহে।

মোরিকা ॥ * * *

বিরহের শ্বাসে কত না তাহার কাঁচুলি নিত্য ছিঁড়িয়া পড়ে,—
একবার তুমি এসো ওগো,— আর সেলাইয়ের সুতা নাই যে ঘরে।

মারুলা ॥ * * *

'কেন ক্ষীণ তনু ?'
'ক্ষীণ কোথা—আমি চিরকাল দেহ এমনি ধরি।'
'কালিমা তবে ও মুখে কেন ?'
'বুঝি রান্নার কালি গিয়েছে ভরি।'
শুধানু যখন— 'মনে নাই মোরে ?'
'নাই, নাই' শুধু বলিয়া মুখে
তখন বালিকা সজল-নয়নে কাঁপিয়া কাঁপিয়া পড়িল বুকে।

মধুর বাণী ॥ * * *

আকারে চন্দ্র, কূজনে কোকিল, পাবাবত চুম্বনে,
গতির ভঙ্গে হংস, হস্তী বিলাস-বিমর্দনে ;
যুবতিকাম্য সব গুণ আছে— কি আব বলিব আমি—
না থাকিত যদি দোষটুকু, – সে যে মোর বিবাহিত স্বামী



শীলা ভট্টারিকা ॥ * * *

কৌমার মোর হয়েছিল যেই, সেই বর, সেই চৈত্ররাতি ;
তেমনি ফুল্ল মালতী-গন্ধ, কদম্ব-বায়ু বহিছে মাতি ;
আমিও তো সেই !— তবু সেদিনের সে-সুরতলীলা কিসের তরে
রেবাতটে সেই বেতসীর মূলে আজিও চিত্ত আকুল করে।

ত্রিবিক্রম ॥ * * *

চক্ষু 'পরে মৃগাক্ষীর চিত্রখানি ভাসে --
রজনীও নাহি যায়, নিদ্রাও না আসে

অজ্ঞাত ॥ * * *

এক

আসে তো আসুক রাতি, আসুক বা দিবা,
যায় যদি যাক্ নিরবধি।
তাহাদের যাতায়াতে আসে যায় কিবা
প্রিয় মোর নাহি আসে যদি।

দুই

হরিণগর্বমোচন লোচনে
কাজল দিয়ো না, সরলে।
এমনি তো বাণ নাশ করে প্রাণ
কী কাজ লেপিয়া গরলে।

তিন

ধীরে ধীরে চলো তন্বী, পরো নীলাম্বর,
অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখো কঙ্কণ-মুখর।
কথাটি কয়ো না, তব দন্ত-অংশু-রুচি
পথের তিমির রাশি পাছে ফেলে মুছি।

নিষ্পট ॥ * * *

লোকে বলে মোর নিষ্ঠুর প্রিয় কালই নাকি যাবে প্রবাসে,
ওগো নিশা দেবী, দীর্ঘায়ু হও, কাল যেন আর না আসে।

অমৃত ॥ * * *

আজই তো প্রবাসে প্রিয়তম গেছে, এখনি শূন্যময়
সকল হৃদয়, প্রাঙ্গণ, পথ, শূন্য সে দেবালয়।

রাজহস্তী ॥ * * *

তোমার মুখের আদল পায়নি চাঁদ,
তাই তো বিধাতা গড়বার বাসনায়
মণ্ডলী-চাঁদ টুকরো টুকরো করে
যুগযুগান্ত ধরে।

অন্ধ ॥ * * *

ওলো সখি, আমি কি করে লিখি যে বল্?
থরো থরো-কাঁপা, ঘামে ভেজা, পাঁচ-
আঙুলের মুঠো হতে
খসে খসে পড়া লেখনীর গতি-পথে
'ভালো আছো'—শুধু এই দুটি কথা
লেখাই হয় না শেষ।

শশিপ্রভা ॥ * * *

যেমনি বাজায় নাচায়, তেমনি নাচি আমি বারে-বারে ;
বৃক্ষটি কভু নড়ে না আপনি, লতা নাচে বেঁড়ি তারে।

অবন্তিসুন্দরী ॥ * * *

যাত্রা সময়ে গুরুজন মাঝে তেয়াগি লজ্জা ভয়,
স্রস্তবসনা ধরিনু তোমায়,—ভুলে গেছ নির্দয় ?

শ্রীশক্তি ॥ * * *

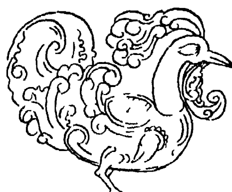
রাত কেটে যায়, তোমরা ঘুমাও, ওগো সখি, আমি কেমন করে
ঘুমাব, আজ যে শেফালী-গন্ধ নয়নের নিদ্ নিয়েছে হরে।

মলয়শেখর ॥ * * *

ধন্য সে নারী, স্বপ্নেও তবু প্রিয় আসে যার বুকটি ভরে ;
দয়িত-বিহনে আসে না নিদ্রা, স্বপ্ন আসিবে কেমন করে।

রাম ॥ * * *

সব প্রেমে বুঝি বঞ্চনা আছে,—তা না হলে কেন বিরহ আসে ?
তা না হলে কেন বিরহ সহিয়া বেঁচে থাকে লোকে
কিসের আশে



অজ্ঞাত ॥ ***

এক

পায়ে সে পড়িল তবু তো চাহিনি ; শুধাল তবু তো দিইনি কান,
চলে গেল, তবু ডাকিনি ফিরায়ে,—তবে কেন আজ করিনু মান।

দুই

শুষ্ক হৃদয়ে জ্বলে না, দ্বিগুণ সরস হৃদয়ে জ্বলে,—
চিরদিন এ কি অতিবিচিত্র ইন্ধন প্রেমানলে !

কর্ণপুর ॥ * * *

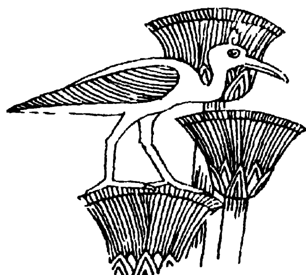
নব যৌবন—আপূর্ণ বাপী লাবণ্যে টলোমল্,
ওই কালো জলে গাহন কামনা কে করে না, সখী, বল্।
তারই কূলে বসে উচ্চকণ্ঠে—অলজ্জ ক্রন্দনে
'হা প্রিয় ! হা প্রিয় !' কাঁদিতে চাই-গো একা একা নিরজনে

'চৌরপঞ্চাশিকা' থেকে

বিহ্লন ॥ * * *

এখনো সে কনক চম্পক সুবরণী।
তনুলোমাবলী ফুল্ল কমলবদনী ॥
শুইয়া উঠিল কামবিহ্বললালসা।
প্রমাদ গণিছে মোর শুনি এই দশা ॥

এখনো সে মোর মনে আছয়ে সর্বথা।
এক রাতি মোর দোষে না কহিল কথা ॥
বিস্তর যতনে নারি কথা কহাইতেঁ।
ছলে হাঁচিলাম জীববাক্য বলাইতে ॥
আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল।
জানায়ে পরিল কানে কনককুণ্ডল ॥



'গীতগোবিন্দ' থেকে

জয়দেব ॥ মানভঞ্জন

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী,
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরম্।

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্,
দেহি মুখকমল মধুপানম্॥ (ধ্রুবম্)

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী,
দেহি খরনয়নশরঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং,
যেন বা ভবতি সুখজাতম্ (প্রিয়ে)॥

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং,
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততম অনুরোধিনী,
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্ (প্রিয়ে)॥

নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং,
ধারয়তি কোকনদরূপম্ ।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি,
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্ (প্রিয়ে) ॥

স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী,
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্ ।
রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে,
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্ (প্রিয়ে) ॥



স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং,
জনিতরতিরঙ্গপরভাগম ।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং,
সরসলসদলক্তকরাগম্ (প্রিয়ে) ॥

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্,
দেহি পদপল্লবমুদারম্ ।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো,
হরতু তদুপাহিতাবিকারম্ (প্রিয়ে) ।

ইতি চটুলচাটুপটুচারু মুরবৈরিণো,
রাধিকামধিবচনজাতম্ ।
জয়তি পদ্মাবতী রমণ জয় জযদেব কবি—
ভারতী ভণিত মতিশাতম্ ॥



৬ মিসরীয়





প্রাচীন প্যাপিরাস থেকে

এক

*** * * ॥ অপরূপা**

তুলনাবিহীন সে যে, সে শুধু একক
রূপময়ী জগতের সকলের চেয়ে।
দেখো, দেখো, সেই নারী দেবীর মতন—
তারা-দেবী—আবির্ভাব যার
সর্বশুভ বৎসরের প্রথম প্রভাতে।
সর্বজয়ী রূপ তার, জ্যোতির্ময় দেহ,
কমনীয় আঁখি দুটি যেদিকে তাকায়,
কী মধু অধর-ওষ্ঠ বাক্যের উৎসার,
ভাষা কই রূপ বর্ণনার :
দীর্ঘ গ্রীবা, দ্যুতিময় স্তনবৃন্ত দুটি,
চুল তার অ-কৃত্রিম বৈদূর্যের ভার ;
বাহু দুটি স্বর্ণেরও অধিক,

পদ্মের কলিকা যেন অঙ্গুলির যথার্থ উপমা,
ক্ষীণ-মধ্য, নিবিড় নিতম্ব
পদযুগে রূপ উছলায়।
কী লাস্যে লীলায় হাঁটে ধরণীর বুকে,
আলিঙ্গনে বন্দী মোর করেছে হৃদয়।
রূপে তার চোখে ধাঁধা লাগে
বিমোহিত পুরুষেরা সম্বিৎ হারায়।
যাকে সে আশ্লেষ দেয়
তার কী উল্লাস,
কামতপ্ত তরুণের দলে
সবচেয়ে ধন্য সে-ই, সে-ই তো নায়ক।
তার গজ-গমনের গতি
ভঙ্গিমায় রঙ্গিমায় রতিকে হারায়।

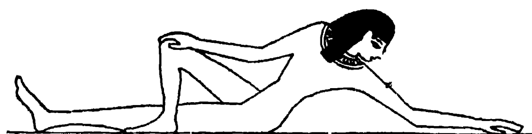
দুই

* * * ॥ * * *

বন্দনা করি হিরণ্ময়ী দেবীর
রাজরাজেশ্বরীর নন্দনবাসিনীর
স্তব গাই সূর্যকন্যা হাথর-এর
আর শতেক ধন্যবাদ আমার প্রিয়তমাকে।
পূজা দিলাম দেবীর কাছে, দেবী আমার প্রার্থনা শুনলেন
প্রিয়তমাকে পাঠিয়ে দিলেন আমার পাশে।
ও এল, স্ব-ইচ্ছায় এল, দেখতে এল আমায়।
আর আমার কী-যে হল, কী-যে কপাল খুলল কেমন করে বলি!
আনন্দ, আনন্দ, আমি উচ্ছ্বসিত, আমি উল্লসিত
সেদিন থেকে—যেদিন প্রথম কানে পৌঁছল, 'ওহে, ও তো এল।'

আর দেখো ও এল আর মদমত্ত যুবকরাও মাথা নিচু করল
ও-মেয়ের প্রতি তাদেরও ভালবাসা এত গভীর।
দেবকন্যার কাছে আমার প্রার্থনা, আমার মিনতি :
দাও, আমার প্রিয়তমাকে দান দাও আমায়।

গতকাল তিন দিন কেটে গেল
দেবীর কাছে মানত করার পর তিন-তিনটে দিন—
আর আজ পাঁচ দিন ও নেই, ও আমার কাছে নেই!



তিন

*** ***

গতকাল সাত দিন হয়ে গেল
প্রিয়তমাকে দেখিনি,
অসুস্থতা পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে
অঙ্গে অঙ্গে জরজর
তনুদেহের স্মৃতিও বুঝি শিথিল।
রাজবৈদ্যরা যদি আসে
ওদের ভেষজে কি জুড়োবে এ-হৃদয়ের জ্বালা?
এ-রোগের বশীকরণ জানা নেই ঐন্দ্রজালিকেরও
হায় রে, রোগ নির্ণয় করে কে?

—একথা বলতে বলতে, আর দেখো, একথা বলতে বলতে
আরাম পেলাম আমি
প্রিয়তমার নামই আমাকে চাঙ্গা করে তুলল ;
দূতীরা ওর আসে যায় আসে যায়
আর আমি পাই আমাদের হৃদয়ের সঞ্জীবন।
প্রিয়তমা আমার সবচেয়ে বড়ো ভেষজ
সমস্ত আয়ুর্বেদের চেয়ে বড়ো,
আমার মুক্তি ওর আগমনে, ওর বাহির ঘরে আসায়,
ওকে দেখলে আমার আরাম
ও চোখ মেললে আমার শক্তি
ওকে আলিঙ্গন দিলে নির্বাসনে যায় অমঙ্গল—
আর সাত দিন, সাতটা দিন ও কাছে নেই, আমার কাছে নেই।

চার

* * * ॥ * * *

এসো এসো প্রিয়তমার পাশে দ্রুতপায়ে এসো :
তুমি যেন এক রাজার দূত—প্রভু অপেক্ষা করে আছেন অধৈর্যে-
যে-করে হোক খবর সংগ্রহ করবে এই যার প্রতিজ্ঞা ;
সেই রাজদূত তুমি যার জন্যে সমগ্র ঘোড়াশাল মজুত
ঘোড়া মজুত পথে পথে সরাইখানায়,
রুদ্ধশ্বাস যার রাস্তা অবিরাম নক্ষত্রবেগ—
সে যেমন এসে পৌঁছয় লক্ষ্যে তার, রাজমহিলার আলয়
উদ্দামহৃদয়।
এসো, তোমার প্রিয়তমার পাশে দ্রুতপায়ে এসো :
রাজার ঘোড়াশালের তুমি যেন এক পক্ষীরাজ

নানাজাতের হাজারো ঘোড়ার মধ্যে বাছাই-করা
আস্তাবলের রাজা।
এ-সেই ঘোড়া যার দানাপানি আজব ধরনের
যার কদম প্রভুর নয়নরঞ্জন
চাবুকের শিস্ কানে নিয়ে যে ছুট দেয় যোজন যোজন,
সঙ্গে ওর পাল্লা দেয় এমন মহারথী মেলে না কোথাও—
ও-তো দূরে নয়, ও আসে, ও-যে আসে
বুকের মধ্যে সাড়া দেয় রাজমহিলার হৃদয়।



এসো এসো প্রিয়তমার পাশে দ্রুতপায়ে এসো :
বালুদেশ-ভাঙা তুমি যেন এক ধাবন্ত বনহরিণ
অঙ্গে অঙ্গে ক্লান্তি, টলন্ত পা
হৃদয়ে সওয়ার মরণভয় ;
আর পিছনে তোমার শিকারী
আর ডালকুত্তারা চারপাশে,
কিন্তু খুরে-ওড়ানো ধুলোর চিহ্ন পাবে না ওরা
ওরা তোমাকে পাবে না, তুমি পেয়ে গেছ আশ্রয়
পেয়ে গেছ নদী, নদীর পথ।

প্রিয়তমার ভালবাসা খুঁজে খুঁজে
চোখের পলক ফেলতে না-ফেলতে
পৌঁছে যাবে তুমি শ্রীমতীর কুঞ্জে।
হিরণ্ময়ী সূর্যকন্যা ওকে-যে সৃষ্টি করেছেন তোমারই জন্যে—
হে বন্ধু আমার!

পাঁচ

নেক্রোপোলিসের লিপিকার ঃ নাখ্‌ত-সেবেক্‌ * * *

প্রিয়তমার ভবনে তোমার সঙ্গে এনো ওকে
হে হৃদয়, সঙ্গে এনো প্রেম
প্রিয়তমার আলয়
প্রিয়তমার কুঞ্জে এল যাবার সময়।
সাজাও প্রিয়তমাকে সাজাও সুকণ্ঠ সঙ্গীতে
সুরা আরো সুরা—ঘেরো সুরা-পাহারায় চতুর্দিক
দিনে যেন মূর্ছা মানে ওর ইন্দ্রিয়ের বোধ
রাত্রে যেন পায় পুনর্জন্ম।
আর প্রিয়তমা বলুক তোমায়, 'বাঁধো বাঁধো—
জাগে দিন আর জাগুক আমাদের প্রেম।'

প্রিয়ার প্রমোদ-কক্ষে তোমার সঙ্গে এনো প্রেম
হে হৃদয়, এসো একা, সঙ্গী ছাড়াই—
লীলাসঙ্গিনীকে যদি একান্ত ঘনিষ্ঠ পেতে চাও।
ঝড়ে ওড়ে তো উড়ুক নল-খাগড়ার ছাউনি বারান্দায়
হাওয়ার পাখায় ভর দিয়ে মাথায় নামুক সর্বনাশ
তবু ঝড়ে না-উড়বে না-পুড়বে প্রেম,

প্রিয়তমা তবু বয়ে আনবে মৃত্যুগন্ধ-দেহ
দেহের সৌগন্ধে ভরবে চতুর্দিক, যে সঙ্গী সে মাতাল ভ্রমর।
হিরণ্ময়ী দেবী তোমাকে মিলিয়ে দিলেন প্রিয়তমা,
হৃদয়ের প্রিয়তমা হৃদয়কে দান দেবে জীবন।

চতুরা রসিকা প্রিয়তমা, পায়ে পায়ে জড়িয়েছে শিকল
ছড়িয়েছে জাল
দীঘল চুলে জড়িয়েছে আমাকে জড়িয়েছে জালে,
এবার ও গেঁথে নিক চোখের বঁড়শিতে,
জয় করে নিক রুজ্‌রঙে,
আমার আত্মায় দিক ওর অধিকারের মোহ্‌রছাপ।
হে হৃদয়, হে আমার হৃদয়,
আলাপের অবসরে ওর কাছে শুধু এই প্রার্থনাটুকু জানিও :
আমি ওকে আলিঙ্গন দিতে চাই ;
দেবতার দোহাই--ওকে বোলো—একমাত্র আমিই এলাম
তোমার প্রার্থী
হাতে আঙরাখা, দেহে দূরপথের শ্রান্তি।



ছয়

*** ॥ **অভয়-মন্ত্র**

ওপারে আমার বঁধুর সোহাগ,
এ পারে রয়েছি আমি ;
মাঝখানে নদী, নদীতে হাঙর,
তবু সে নদীতে নামি ;
ঝাঁপ দিয়া তবু পড়ি তরঙ্গে
স্মরিয়া তাহার মুখ,
বঁধুর প্রেমের রভসে আমার
দ্বিগুণ বেড়েছে বুক ;
তরল সলিলে সোপান মানিয়া
অবাধে নামিয়া যাই,
বঁধু শিখায়েছে অভয়-মন্ত্র
আর কোনো ভয় নাই।

সাত

*** ॥ **মিলনানন্দ**

যখনি তাহারে আসিতে দেখিতে পাই,
হৃৎ-পিণ্ডটা দ্রুত তালে উঠে দুলে ;
দু-বাহু বাড়ায়ে বাহুতে বাঁধিতে চাই,
অসীম পুলক উথলে হৃদয়-কূলে !

ভুজবন্ধনে বন্দী যদি সে করে,
তনু আরবের আতরে তিতিয়া উঠে ;
চুমে যদি হাসি-বিকচ-বিম্বাধরে,
বিনা মদিরায় সংজ্ঞা আমার টুটে।

আট

* * * ॥ * * *

আমার বঁধুর দেহ যেন এব পদ্মকুঁড়ির দীঘি,
স্তন ও তো নয়, রসে ডগোমগো যমজ ডালিম দুটি,
ভুরু দুটো যেন মেরু-বনে পাতা শিকারী মেয়ের ফাঁদ,
আর আমি এক বুনো হাঁস যেন ধরা পড়ে গেছি ফাঁদে।

নয়

* * * ॥ * * *

উরুযুগলের আশ্লেষ মাগো যদি
স্তনযুগ মরে কেঁদে।
ক্ষুধায় পীড়িত বলে কি, বন্ধু,
এখনিই যাবে চলে—
তুমি কি ঔদরিক ?
বেশ হয় নাই বলে কি, বন্ধু,
এখনিই যাবে চলে ?
এই তো আমার রয়েছে আচ্ছাদন।
তৃষ্ণাকাতর বলে কি, বন্ধু,
এখনিই যাবে চলে ?
কানায় কানায় পূর্ণ এ-বুক
উছলে তোমার তরে—
নাও নাও, তুমি নাও।
আজ অপরূপ দিন।
তোমার প্রেম যে আমার তনুর
অণুতে অণুতে মেশে ;

প্রেয়সীর কাছে এসো এসো, ওগো,
দ্রুত অশ্বের বেগে।

দশ

* * * ॥ * * *

ভাবো, তোমার প্রেম আমার হৃদয়ের আশ্রয় পাবে না ?
দেবো না যেতে দেবো না
ওরা আমায় যতই মারুক যতই ধরুক
লাঠি-সোঁটায় তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাক প্যালেস্টাইন-ভূমি,
তালপাতার ডাঁটার ঘায়ে ইথিওপিয়া পার করুক,
সড়কি উঁচিয়ে পার করুক পাহাড়
বল্লম দিয়ে পেড়ে ফেলুক মাটিতে—
ফাঁদে ওদের পা দেবো না, কিছুতে না
ভুলবো না তোমাকে, ভুলবো না তোমার প্রেম।

এগারো

* * * ॥ * * *

খেয়া নৌকোয় দূরের পাল্লা ধরেছি
ভাটার স্রোতে,
কাঁধে বইছি নল-খাগড়ার বোঝা।
মেম্ফিসে পৌঁছুব,
সত্যের দেবতা তাহ্-কে নিবেদন জানাবো ঃ
'আজ রাতে প্রেয়সীকে এনে দাও আমার কাছে।'
নদী যেন মদের ধারা, তাহ্ তার নল-খগড়ার বন,
শেখ্‌মেত্ পদ্ম, আরিত্ কুঁড়ি, আর
নেফের্-তেম্ তার ফুটন্ত ফুল।
তার রূপেই তো ঊষার আবির্ভাব।

সেই সু-মুখ দেবতার সামনে
মেম্ফিস্ যেন ডালিমের নৈবেদ্য সাজানো
একখানা থালা।

বারো

* * *   * * *

প্রিয়ার দারুণ নির্মম অবিচারে
আজ গৃহকোণে শয্যা নেব যে আমি
ব্যাধি জর্জর দেহে।
পাড়াপড়শিরা দেখতে আসবে ছুটে।
প্রিয়া আসে যদি তাদেব সবার সাথে
বৈদ্য লজ্জা পাবে,
কারণ, সে শুধু জানে এ-ব্যাধির কথা।



তেরো

* * * ॥ * * *

প্রিয়ার প্রাসাদ-সৌধ, তাহার দুয়ার মধ্যখানে-
সে দুয়ার আজ খোলা।
বার হয়ে এল ক্রুদ্ধ কুপিত প্রিয়া।
আহা, আমি তার নফর হতাম যদি
তাহলে ভাগ্যে জুটতো তিরস্কার,
ভীত শঙ্কিত অবোধ শিশুর মতো
তাহলে দু-কানে শুনতে পেতাম, আহা,
কুপিত প্রিয়ার কণ্ঠের ঝংকার।

চোদ্দ

* * * ॥ **নিষ্ফলারম্ভ**

মৃণালের লাগি কাঁদিছে মরাল
কাতরে বিদায় কালে,
তুমি তো দিলে না ভালবাসা, শুধু
আমি জড়াইনু জালে ;
হৃদি-তন্ত্রিতে পড়েছে গ্রন্থি
কেমনে ছিঁড়িব, হায়,
কেমন করিয়া এড়াব না জানি,
ছাড়াতে জড়ায় পায় !

নিত্য যে আমি সন্ধ্যাবেলায়
নিয়ে যাই পাখি ধরে,
পরিজনে যদি শুধায় আজিকে
কি কহিব উত্তরে ?

তোমার প্রেমেরে বন্দী করিতে
আজি পেতেছিনু জাল,
নিষ্ফলে বেলা ফুরাল আমার
বৃথা কেটে গেল কাল।

পনেরো

* * * ॥ * * *

পাখির কণ্ঠে এলো প্রভাতের ডাক ঃ
'রাত অবসান যাত্রা হবে না শুরু?'
ডেকো না ডেকো না, ওগো প্রভাতের পাখি,
হৃদয়ে হেনো না শেল।
বঁধু যে এখনো শয্যায় সুখাসীন
হৃদয় আমার আহ্লাদে ডগোমগো।
আমাকে বলেছে সে যে ঃ
'যাবো নাকো চলে কখনোই দূরদেশে ;
আমার এ হাত রেখেছি তোমার হাতে,
এখানে ওখানে, যত মনোরম ঠাঁই—
যেখানেই যাই তোমার সঙ্গী আমি।'
রমণীর দলে আমাকে করেছে রানী,
বঁধুয়া আমার হৃদয়ে হানে না শেল।

ষোলো

*** * * ॥ মনোজ্ঞা**

তোমার মনের মতন হইতে কি যে ছিল প্রয়োজন,
সে কথা আমারে দিয়েছিল বলে গোপনে আমারি মন।
তুমি যাহা চাও, চাহিবার আগে, আমি তা করিয়া রাখি,
যেখানে যখন খুঁজিবে বন্ধু সেখানে তখন থাকি।
পাখি মারিবার তীরধনু লই পাখি ধরিবার জাল,
মৃগয়ার মাঠে ছুটে সারা হই, রোদে হয় মুখ লাল ;
আরবের পাখি মিসরে আসে গো আতর মাখিয়া পাখে,
টোপের উপর ঠোকর মারিয়া শূন্যে ঘুরিতে থাকে !
গায়ে আরবের ফুলের গন্ধ, পায়ে তার খস খস,
তোমারে বন্ধু মনে পড়ে গেল, আখি হল সুখালস,
শুধু কাছাকাছি পেলে তোমা বাঁচি অধিক কামনা নাই,
তীব্র মধুর নূতন এ সুর বারেক শুনাতে চাই।

সতেরো

* * * ॥ * * *

খোলা দরজায় চোখ দিয়ে বসে
পথ চেয়ে কাল গুনি,
বঁধুয়া আসে কি, পথে চোখ রাখি
পায়ের শব্দ শুনি।
বঁধুয়ার প্রেম সার বলে মানি,
প্রেম সে জীবন ধন ;
বঁধুয়ার প্রেমে হৃদয় আমার
মুখরিত অনুখন।

বঁধুয়ার দূতী এল আর গেল,
জানালো বঁধুর কথা,
জানালো ঃ কি দোষ করেছিনু বলো
হৃদয়ে রহিল ব্যথা।
অর্থ কি তার ? কী দোষ করেছ ?
ভেবে ভেবে তাই মরি।
প্রেম প্রেম, বঁধু, হৃদয় গভীরে
প্রেমেরই স্মরণ করি।
আধেক কবরী সবে বাঁধা হল
এখনো অনেক বাকি,
তুমি যদি ডাকো বেণী-বিনোদনে
নিজেকে কি দেব ফাঁকি ?
তবু তুমি যদি ভালবাসো, বঁধু,
ভালবাসো, তাই শুনে
চূর্ণ-অলক-প্রসাধন নিয়ে
বসে রব কাল গুনে !



আঠারো

* * * ॥ **মধুর পদাবলী**

মেখ্‌মেখ্‌-ফুল মালায় হয়েছে গাঁথা !

হৃদয়কে তুমি করেছ দ্বন্দ্বহীন।
নর্ম আমার তোমারই ইচ্ছাপূরণ।
তোমার বাহুর বন্ধনে যবে বাঁধো,
তোমাকে দেখা-ই আমার চোখের আলো ;
নিবিড়াশ্লেষে আরও ঘন হয়ে আসি
তোমার প্রেম যে স্পষ্ট প্রতীয়মান।
তুমি যে পুরুষ,—তোমারই আকাঙ্ক্ষায়
হৃদয় আমার চিরদিন প্রত্যাশী।
প্রহর আমার আহা কি মধুর মধুর !
তোমার পার্শ্বে শয্যায় সুখাসীন
একটি প্রহর অনন্ত হত যদি।
এই রাত—এই মধুমিলনের রাতে
হৃদয়কে তুমি করেছ ঊর্ধ্বমুখী।

সেআমু-ফুলেরা মালায় হয়েছে গাঁথা !

এ ফুলের মালা গলায় দুলবে যার
সকলের মাঝে সে-ই হবে গরীয়ান।
তোমার জীবনে আমি-ই প্রথম নারী।
আমি যেন এক সাজানো ফুলের বাগান

ফুলে ও পাতায় সাজানো নিজের হাতে,
কত না গন্ধ-লতায় অলংকৃত।
দখিনা হাওয়ার শীতল ছোঁয়ায় ছোঁয়ায়
নিজহাতে তুমি কেটেছ গভীর খাল
আমার বাগানে সবচেয়ে মনোরম।
এই মনোরম বিজনে আমি যে ঘুরি ;
তোমার ও-হাত রেখেছ আমার হাতে
তুমি আর আমি—একসাথে আজ ঘুরি
তাই তো হৃদয় উল্লাসে ডগোমগো।
অমৃত অমৃত—তোমার কণ্ঠ-শোনা,
কানে শুনি তাই পরাণ রেখেছি ধরে।
তোমার ও-রূপ যখনি দু-চোখে হেরি
মিছে মনে হয় পান-ভোজনের রুচি।

জাইত্-ফুলেরা মালায় হয়েছে গাঁথা !

নেশায় যখন সংজ্ঞা হারাবে তুমি
মাথার মুকুট যতনে রাখবো খুলে,
সুখশয্যায় শরীর এলায়ে দিও,
আমি বসে রব চরণ-আলিঙ্গনে।



উনিশ

* * * ॥ **সাধ**

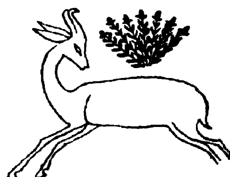
তোমার দুয়ারে দ্বারী হতে পেলে আমি তো ভাই
কিছু না চাই,
বাঁচিয়া যাই !
ভর্ৎসনা-বাণী কম্পিত মনে শুনি গো কত
শিশুর মত,
নয়ন নত ।
আমি যদি হায় হতাম তোমার হাবসী দাসী,
রূপের রাশি,
নিকটে আসি
অবাধে দু-চোখ ভরি দেখিতাম ; সরম ভরে
যেতে না সরে
ঘোমটা পরে !
হতাম যদি ও করে অঙ্গুরী, কণ্ঠে মালা,—
হৃদয় আলা !
রূপসী বালা !
মালারি মতন দুলিতাম তবে হৃদয় তলে,
নানান ছলে,
বেড়িয়া গলে ;
এক হয়ে যেত অঙ্গুলি আর অঙ্গুরীতে,—
অতি নিভৃতে,—
দুইটি চিতে ।

কুড়ি

***** ॥ আভাস**

কুসুম-ফুলের রং ধরেছে ধোয়া চাদরে,
রঙীন্ হয়ে উঠেছে মন তোমার আদরে
জলের সঙ্গে মিশলো সুরা,
হৃদয়খানি হল পুরা ;
অনুরাগের তপ্ত ধুনায় গন্ধ না ধরে।

ঘোড়-সওয়ারের সখের ঘোড়া হাওয়ায় ছুটেছে,
যেখানটিতে ডঙ্কা বাজে আপনি জুটেছে !
সুপ্ত দীপের সলিতাতে,
গুপ্তশিখা লাগল রাতে,
খুলতে আঁখি শিকারী বাজ শূন্যে লুটেছে।



❧ হিব্রু





'ওল্ড টেস্টামেন্ট' থেকে

রাজা সলোমন পদাবলী

প্রথম অধ্যায়

সলোমনের এই সেই উজ্জ্বল পদাবলী ঃ

বধূ ঃ

তোমার অধরের চুম্বনপুঞ্জের পিয়াসী আমি,
কারণ সুরার চেয়েও মধুর তোমার নর্মলীলা।
মহার্ঘ অভ্যঞ্জনে চর্চিত তোমার দেহ ;
ধারাগলিত গন্ধরসের সৌরভ যেন তোমার নাম ;
তাই তো কুমারীজনের বল্লভ তুমি।
যদি ডাকো আমাদের, তা হলে তোমার অনুগামিনী হই

রাজা, আমাকে তোমার প্রাসাদভবনে নিয়ে চলো ;
তোমার আসঙ্গে অবাধ হোক আমাদের উল্লাস ;
সুরার-ও অধিক স্মরণীয় হোক তোমার প্রেম।
সুজন যারা, তাদেরই যে তুমি ভালবাসার ধন।

জেরুজালেমের নাগরীরা শোনো,
শ্যামা আমি,
তবু আমি সুন্দরী —
যেমন সুন্দর কেদার-জাতির শিবির শ্রেণী,
যেমন সুন্দর সলোমনের কারু-যবনিকা।
কালো বলে আমায় কু-চোখে দেখো না ;
সূর্যের কটাক্ষে কালো হয়েছে আমার দেহবর্ণ।
অসূয়ার বশে
ভাইয়েরা আমাকে তাদের দ্রাক্ষাবনের প্রহরী করেছে,
আর আমার দ্রাক্ষাবন
অনাদরে গেছে নষ্ট হয়ে।

হে দয়িত !
বলো আমায়, কোথায় চরাও তোমার পশুপাল,
কোথায় তাদের মধ্যদিনের বিরাম-ভূমি।
পথ হারিয়ে তোমার সমজুটিদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াতে
আমার মন সরে না।

বর ঃ

রূপবতী, যদি পথ হারাও,
চলে যেয়ো তোমার পশুযূথের পিছু-পিছু,

তাদের চারণে নিয়ে যেয়ো
যেখানে ডেরা বেঁধেছে রাখালযুবার দল।

দয়িতা আমার!
মিসর-রাজের রথের অশ্বীই তোমার উপমা
রত্নজালে রমণীয় তোমার কপোল ;
নিষ্কহারে কমনীয় তোমার কণ্ঠ।
তোমার অঙ্গে পরাবো সেই বসন
যার সোনার পাড়ে রূপোর চুম্‌কি।



বধূ ঃ

আমার কেশতৈলের গন্ধে আমোদিত ঘরে
রাজা আমার বসে রইবে তার সুখাসনে।
প্রিয়তম যেন আমার গান্ধার-পুটের হার ;
আমার যুগল স্তনের অন্তরালে
তার সারা রাত্রির বিশ্রাম।
এন্‌গেদির দ্রাক্ষাবনে বিকশিত
স্বর্গপুষ্পের স্তবক আমার কান্ত, আমার বল্লভ।

বর ঃ

সুন্দরী—অতি সুন্দরী তুমি, হে দয়িতা !
যুগল আঁখি তোমার পারাবতীর উপমা।

বধূ ঃ

সুন্দর—অতি সুন্দর তুমি, হে দয়িত !
সকল সুখের নিলয় তুমি।
দেখো, কেমন শ্যামল আমাদের বাসক-শয়ন।
দেবদারু আর সর্জতরুর শাখায়, দেখো,
কেমন সুন্দর আমাদের এই বন-ভবনের গৃহকূট

দ্বিতীয় অধ্যায়

বধূ ঃ

শারনের হৈমন্তী কেশর আমি,
আমি শারনের তৃণ-কুঙ্কুম।

বর ঃ

প্রিয়া আমার নারীদলে যেন কাঁটায় ঘেরা
স্থলকুমুদের ফুল।

বধূ ঃ

পুরুষের দলে প্রিয়তম যেন বনবেষ্টিত আপেল-তরু
পরম আনন্দে আমি তার ছায়ায় বসেছি ;

তার ফলের আস্বাদ এখনো লেগে রয়েছে আমার মুখে।
সে যেন নিয়ে এসেছে আমায়
আনন্দের আপানকে ;
আর আমার মাথার উপরে তুলে দিয়েছে সেই নিশান
প্রেম যার দ্বিতীয় নাম।

ওগো, তোমরা দলিত দ্রাক্ষায় আর আপেলের ফলে
আমায় উপশান্ত করো।
আমি প্রেম-তাপিতা।

তার ডান হাতখানি সে রেখেছে আমার মাথার নিচে
আর বাম বাহু দিয়ে
সে আমায় বেঁধেছে আলিঙ্গনে।

জেরুজালেমের নাগরীরা, আমার গোহারি শোনো ;
মাঠের ভীরু হরিণীদের দোহাই,
যতক্ষণ না তৃপ্ত হয় আমার বল্লভ,
শোরগোল তুলে তোমরা তাকে জাগিয়ো না।

ঐ শোনো আমার প্রিয়তমের কণ্ঠস্বর !
দেখো, দেখো,
তরুণ হরিণের মতো প্রিয় আমার
কতো গিরি-পর্বত উল্লঙ্ঘনে পার হয়ে চলে এসেছে।
দেখো, দেখো, আমাদের ঘরের প্রাচীরের আড়ালে
সে দাঁড়িয়ে আছে।
জানালা আর ঝরোখার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখা যায়।

আমার বল্লভ আমাকে ডাক দিয়ে বলছে ঃ
জাগো সুন্দরী দয়িতা, চলে এসো ঘর ছেড়ে।
দেখো, শীত নেই আর,
ক্ষান্ত হয়েছে মেঘের ধারাবর্ষণ ;
ফুলে ফুলে ছেয়ে গিয়েছে পৃথিবী ;
এসেছে পাখিদের কাকলিমুখর দিন ;
সারা দেশ ভরে শোনা যায় পারাবতের কল-কূজন।
ডুমুরের গাছে গাছে ধরেছে সবুজ ফলের গুচ্ছ ;
আঙুরের বন আমোদিত হয়ে উঠল
নবমুকুলের গন্ধে।
জাগো সুন্দরী দয়িতা, চলে এসো ঘর ছেড়ে।

বর ঃ

আমার পারাবতী তুমি
গিরির গুহায়, দুর্গম শিখরের সংগুপ্ত স্থানে, লুকিয়ে আছ
আমাকে তোমার কমনীয় মুখখানি দেখতে দাও,
শোনাও তোমার মধুর কণ্ঠস্বর।

বধূ ঃ

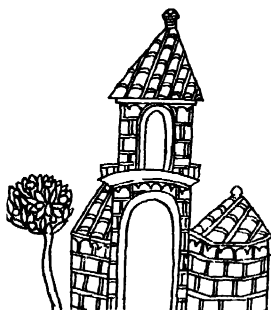
আমাদের আঙুরলতায় ধরেছে নতুন ফল ;
ধরো, ধরো, ঐ শেয়ালের ছানাগুলোকে ধরো,
আঙুর-বনের দস্যু ওরা।
আমার বল্লভ, আমারই একান্ত সে, আমিও তার।
আমার বল্লভ, সে যেন স্থলকুমুদের বনচারী রাখাল।
যতক্ষণ না ভোর হয়, যতক্ষণ রাত্রির ছায়া না পালায়,
এসো প্রিয়তম,

বেদার-শৈলের তরুণ হরিণের মতো
বিহার করো।

তৃতীয় অধ্যায়

বধূ :

রাত্রে তাকে আমার শয্যায় না পেয়ে
অনেক খুঁজলাম, তবু তার দেখা পেলাম না।
তখনই উঠে তাকে নগরের গলিপথে খুঁজতে বেরোলাম ;
নগরের চত্বরে চত্বরে প্রিয়কে আমার খুঁজে বেড়ালাম,
তবু দেখা পেলাম না।



প্রহরীরা আমার পথ আটকালো,
তাদের শুধালাম, তোমরা কি আমার কান্তকে দেখেছ ?
ক্ষণকাল পরে
আমার প্রিয়তমকে দেখতে পেয়ে

ধরে আনলাম তাকে একেবারে আমার মায়ের অন্তঃপুরে,
সেই ঘরে,
যেখানে তিনি আমায় গর্ভে ধরেছিলেন।

জেরুজালেমের নাগরীরা, আমার গোহারি শোনো ;
মাঠের ভীরু হরিণীদের দোহাই,
যতক্ষণ না তৃপ্তি পায় আমার বল্লভ,
শোরগোল তুলে তোমরা তাকে জাগিয়ো না।

সঙ্গিনীর দল ঃ

চারণভূমির পথ বেয়ে,
গান্ধার, সিতকুন্দুরু আর বিবিধ গন্ধরেণুতে সুরভি,
ঋজু ধূমরেখার মতো
এ কে আসে।
ঐ দেখো তার তাঞ্জাম, সলোমনের তাঞ্জাম ;
ইস্রায়েলের বাছাই-করা ষাট বীর তার কাহার।
সবাই তারা রণনিপুণ ;
তাদের সবারই কাছে তরবারি ;
রাত্রির শঙ্কায়
সেগুলি তারা ঊরুর উপরে ধরে রেখেছে।
জেরুজালেমের মেয়েদের জন্য
রাজা সলোমন তাঁর শিবিকাখানি তৈরি করেছেন,
লেবাননের কাঠে।
থামগুলি তার রূপার আর তলাটি তার সোনার।
ছাউনি তার নীলারুণ রাজ-বসন,
আর তার মাঝখানটি মুড়ে দিয়েছেন

ভালবাসায়।
এসো জেরুজালেমের মেয়েরা,
চলো দেখে আসি
সলোমনের টোপর-পরা মুখ।
তাঁর বিবাহদিনের পরম আনন্দলগ্নে
ঐ টোপর তাঁর মা দিয়েছেন পরিয়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

বর ঃ

সুন্দরী তুমি —অতি সুন্দরী, হে দয়িতা !
অবগুণ্ঠনের আড়ালে
তোমার আঁখিদুটি যেন পারাবতী ;
গিলিয়াদের গিরিসানু বেয়ে নেমে আসা
কৃষ্ণ ছাগযূথ যেন তোমার অলকদাম।
সন্ত লূনিতলোম, নবস্নাত, অবিরল,
সর্বসম মেষ-পংক্তির মতো
তোমার দশন।
তোমার যুগল অধর যেন রক্তসূত্রের গুচ্ছ,
আর বাণী তোমার চিত্তহারিণী।
তোমার অলকান্তরিত কপোল—
সে যেন কর্তিত দাড়িম্বের ফল।
বীর যোদ্ধাদের সহস্র বর্ম-ফলকে আলম্বিত
দাউদের অস্ত্রসৌধ যেন তোমার গ্রীবা।

তোমার যুগল স্তন
যেন স্থলকুমুদের প্রান্তরে চরে বেড়ানো
দুটি হরিণশিশু।
যতক্ষণ না দিনের আলো দেখা দেয়,
যতক্ষণ রাত্রির ছায়া না পালায়,
ততক্ষণ গন্ধরসের শৈলে—
সিতকুন্দুরুর গিরিভূমিতে আমার বিহার।

প্রিয়তমা,
সর্বসুন্দরী তুমি ; কোনো খুঁত নেই তোমার রূপে।

ওগো বধূ,
আমার সঙ্গে লেবানন ছেড়ে চলে এসো।
আম্মানার গিরিশিখর থেকে—
বৃকসিংহসংকুল শেনীর-হর্মনের শৈলচূড়া থেকে
অবারিত করে দাও তোমার দৃষ্টি।

হে প্রেয়সী,
আমার হৃদয় হরণ করেছ তুমি।
তোমার হারের একটি দোলকে—
তোমার চোখের একটি চাহনি দিয়ে
আমার মনকে হরণ করেছ তুমি।
প্রিয়া, জায়া আমার,
কী সুন্দর তোমার প্রেম,
সুরার চেয়েও কত মধুর তোমার নর্ম,
গন্ধ-ওষধির চেয়েও কত সুরভি তোমার বিলেপন।

ওগো বধূ,
মধুক্ষরা তোমার দুটি অধর ;
তোমার রসনায় বইছে
মধু আর দুধের নদী ;
লেবাননের সৌরভ তোমার বেশবাসে।
আমার প্রিয়া, আমার বধূ,
—সে যেন অর্গলিত উপবন,
—সে যেন সংগোপিত স্বাদুজলের উৎস।
তোমার কাননের তরুদল—
তারা কেবল ফলপুঞ্জিত ডালিমের কুঞ্জ,
তারা কেবল কর্পূর, জটাবতী আর কেশর,
গন্ধবেতস, দারুচিনি, সর্জতরু আর অগুরুর বন,
তারা শুধু মহোত্তম গন্ধ-ওষধির বন।
উপবনের সরিতা তুমি, প্রাণোচ্ছল জলধারার উৎস তুমি,
তুমি লেবাননের নদীমালা।



বধূ ঃ

জাগো উত্তরের হাওয়া,
এসো দক্ষিণ সমীরণ,
আমার উপবনের উপর দিয়ে বয়ে যাও,
মুক্ত করো তার ওষধি-গন্ধের ধারা ;
কান্ত তার উপবনে প্রবেশ করে
স্বাদুরস ফল-ভুঞ্জনে নিরত হোক।

পঞ্চম অধ্যায়

বর ঃ

আমার উপবনে আমি প্রবেশ করেছি,
হে প্রেয়সী।
আহরণ করেছি তার গুগ্‌গুল আর গন্ধ-ওষধি
আহার করেছি তার মধুচক্র—
পান করেছি দুগ্ধ আর দ্রাক্ষাসব।
বন্ধুরা শোনো,
প্রেমের উৎসবে ভূরিভোজ করো তোমরাও,
পান করে নাও প্রেমের প্রাচুর্য।

বধূ ঃ

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম ;
তবু হৃদয় আমার জেগে ছিল।
শুনতে পেলাম প্রিয়তমের কণ্ঠস্বর।

দ্বারে আঘাত করে সে বলছে :
প্রেয়সী আমার, কপোতী আমার,
আমার অপাপবিদ্ধা দয়িতা,
দ্বার খুলে আমায় ডেকে নাও।
দেখো,
হিম-কণায় ভরে গিয়েছে আমার কেশ,
রাত্রির আসারে সিক্ত আমার অলকদাম।

আমি যে আমার অঙ্গরাখা খুলে রেখেছি,
—এখনই আবার তা কি করে পরি ?
পা-যে ধুয়ে ফেলেছি—
এখনই আবার তা কি করে অশুচি করি ?

দরোজার ঘুলঘুলি দিয়ে
প্রিয়তম তার হাতখানি বাড়িয়ে দিয়েছে।
দেখে, মনটা আমার কেঁদে উঠল তার জন্য।

প্রিয়ের জন্য দ্বার খুলবো বলে উঠলাম ;
কুলুপের হাতলে গন্ধরসে চর্চিত আমার হাতখানি—
তরল গান্ধারবিলেপনে সুরভি আমার আঙুলগুলি—
রাখলাম।
দ্বার খুললাম,
কিন্তু তখন সে আর সেখানে নেই।
যখন সে ডেকেছিল
তখন কুণ্ঠা ছিল মনে ;
যখন খুঁজলাম, তখন আর তাকে পেলাম না।

ডাকলাম,
কিন্তু সে আর আমায় সাড়া দিলে না।

আমাকে পথে দেখতে পেয়ে
নগর-রক্ষীরা প্রহারে জর্জরিত করলো আমায় ;
নগর প্রাকারের প্রহরীরা
কেড়ে নিল আমার উত্তরীয়বাস।

জেরুজালেমের নাগরীরা,
আমার গোহারি শোনো ;
যদি আমার দয়িতের দেখা পাও,
তাকে বলো, আমি প্রেম-তাপিতা।

সঙ্গিনীর দল ঃ

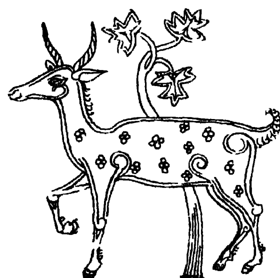
সুন্দরী ! কি এমন আছে তোমার বল্লভের মধ্যে
যাতে এমন অনন্য সে ?
কিসে এত ভালো তোমার ভালবাসার ধন,
যে জন্য তোমার এত আর্তি ?

বধূ ঃ

আরক্তগৌর আমার কান্তের দেহবর্ণ,
অসংখ্যের মধ্যেও অ-দোসর সে।
সোনায় গড়া পুতুল তার মুখখানি,
ঘন চুল তার কাকের চেয়েও কালো।
দুধে-ধোওয়া, সুঠাম দুটি চক্ষু তার
যেন ভরানদীর প্রান্তচারী পারাবতের চক্ষু।

তার কপোল যেন সৌরভের পর্যঙ্ক,
যেন পেলব কুসুম ;
স্থলকুমুদের মতো রক্তিম তার যুগল অধর থেকে
যেন সুরভি গন্ধরস ঝরে পড়ে।
পুষ্পরাগমণিতে খচিত
সোনার অঙ্গুরীয় যেন তার বাহুদুটি ;
তার উদর
যেন বৈদূর্যে রঞ্জিত উজ্জ্বল গজদন্তের পাটা।
সোনায় বাঁধানো মর্মরশিলার থাম যেন
তার পা দুখানি।
সর্জতরু-বহুল মনোহর লেবানন যেন তার মুখ।

মধুর অতি মধুর তার বাণী ;
অতিশয়িত তার কমনীয়তা।
জেরুজালেমের নাগরীরা !
শোনো, এমনই আমার বল্লভ,
এমনই আমার বঁধু।



সঙ্গিনীর দল ঃ

সুন্দরী, কোথায় গিয়েছে তোমার কান্ত ?
কোন্ পথে তুমি আর তার দেখা পেলে না ?
চলো, তোমার সঙ্গে
তাকে আমরা খুঁজতে বেরোই।

বধূ ঃ

কান্ত গিয়েছে তার উপবনে, তাব সুরভিশয্যায়
সেখানে তার গোষ্ঠ-বিহাব,
সেখানে চয়ন করবে সে
স্থলকুমুদের পুঞ্জ।
আমার প্রিয়তমেরই আমি,
একান্ত আমারই আমাব বল্লভ ;
স্থলকুমুদেব প্রান্তবে সে
চাবণ করে।

বব ঃ

আনন্দশৈল তির্জার মতো সুন্দরী তুমি,
হে দয়িতা !
জেরুজালেমের মতো অনবদ্য তুমি,
চণ্ডী তুমি বৈজয়ন্তবতী সেনার মতো।
সংহরণ করো তোমার কটাক্ষ,
আমি অভিভূত।

গিলিয়াদের গিরিসানু বেয়ে নেমে আসা
কৃষ্ণ ছাগযূথ তোমার অলকদাম।
সদ্যস্নাত, সর্বসম, অবিরল
মেষপংক্তি যেন তোমার দশনশ্রেণী।
অলকান্তরিত কপোল তোমার
যেন কর্তিত দাড়িম্বফল।

ষাটজন রানী আছেন আমার,
আরো আছে আশিজন অবরোধের নারী,
আছে সংখ্যাতীত কন্যকা।
কিন্তু অনন্যা আমার পারাবতী, আমার অপাপবিদ্ধা জায়া
অনন্যা সে তার মাতৃগৃহে,
মনের মতো মেয়ে সে তার মায়ের।
তার দেখা পেয়ে আমার কন্যকারা,
আমার রানী আর অবরোধের নারীরা,
আশিস্ জানিয়ে স্তুতি গেয়েছে তার।

সঙ্গিনীর দল ঃ
ঊষার মতো দেখা দিল কে এই নারী ?
চাঁদের মতো সুন্দর, সূর্যের মতো নির্মল,
বৈজয়ন্তবতী সেনার মতো চণ্ডী, কে এই নারী ?

বধূ ঃ
বাদামের বাগিচায় গিয়েছিলাম
উপত্যকার নূতন তরু দেখবো বলে,
আঙুর-লতার মঞ্জরী

আর ডালিমের মুকুল দেখবো বলে ;
সহসা কি হল আমার—
আমার মন চলে গেল
আম্মিনাদিবের রথে।

সঙ্গিনীর দল :

ফিরে এসো, ফিরে এসো, হে শুলেমবাসিনী !
তোমাকে নয়নভরে দেখতে দাও।

বধূ :

কি দেখবে তোমরা এই শুলেমবাসিনীর ?

সঙ্গিনীর দল :

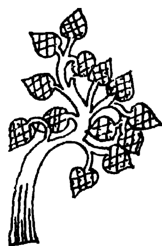
আমরা দেখবো তার
মহানয়িমের নাচ।

সপ্তম অধ্যায়

বর :

হে রাজপুত্রী !
কী সুন্দর তোমার পাদুকাবৃত চরণের উৎক্ষেপ
জানুসন্ধি তোমার
যেন কুশলী শিল্পীর কারু-রচনা।
মদিরোচ্ছল সোনার চষক যেন তোমার নাভি।

স্থলকুমুদ-পুঞ্জিত গোধুম-সম্ভার
যেন তোমার কুক্ষি।
তোমার যুগল স্তন
—তা যেন যমজ মৃগশিশুর দ্বন্দ্ব।
গজদন্তের মিনার তোমার গ্রীবা ;
বাথ্‌রাব্বিমের তোরণপ্রান্তে রয়েছে
যে মীনসংকুল সরসী
তারই মতো তোমার চক্ষু ;
দামস্কের পানে চেয়ে থাকা
লেবাননের মিনার যেন তোমার দীর্ঘশ্বাস।
কার্মেলের গিরি-কান্তার যেন তোমার শিরোদেশ
নীলারুণ রাজবসনের আবরণী যেন তোমার কেশ



রাজাধিরাজ
তোমার অলকের ফাঁদে বন্দী।
কী সুন্দর তুমি, হে দয়িতা !
নর্মলীলার কী সুখময় আকর তুমি।
দীর্ঘ তোমার দেহখানি যেন তালতরু,
পুঞ্জিত দ্রাক্ষার স্তবক তোমার
স্তন যুগল।

আমার কথা শোনো,
আমি যাবো সেই তালতরুর কাছে,
গ্রহণ করবো তার শাখা ;
এখনই তো পাবো তোমার
দ্রাক্ষার স্তবকের মতো স্তনযুগ,
আর তোমার নাসার নিশ্বাস
যা আপেলের মতো সুরভি।
প্রিয়ার জন্য সঞ্চিত, অতি মহার্ঘ মদিরা যেন তোমার
মুখমধু,
সমস্ত অন্তর মাধুর্যে ভরে দিয়ে যা নেমে আসে,
যা পান করে
নিদ্রাকাতরও কথা কয়ে ওঠে।

বধূ ঃ
আমার প্রিয়তমেরই আমি,
আমিই তার কামনার ধন।
এসো প্রিয়তম,
চলো যাই শস্যপ্রান্তরে বিচরণ করি ;
চলো গিয়ে গ্রামাঞ্চলে ঘর বাঁধি।
রোজ ভোরে উঠে চলো যাবো আমরা
আঙুরলতার বনে ;
দেখবো গিয়ে দ্রাক্ষামঞ্জরী ফুটলো কি না,
ডালিমের বউল দেখা দিল কিনা ;
সেখানেই তোমাকে উজাড় করে দেবো আমার
ভালবাসা।
সেখানে গন্ধ দেবে শোণবিন্দুর ফল ;

আমাদের হুয়ারের পাশে ফলবে
স্বাত্ত্বরস বিবিধ ফলের তরু ;
ওগো প্রিয়তম,
তোমারই জন্য তুলে রাখবো আমি
তাদের তরুণ এবং পরিণত, সমস্ত ফল।

অষ্টম অধ্যায়

বধূ ঃ

আমার মায়ের হুধ খেয়ে বড়ো হওয়া
আমার আপন ভাই হতে যদি,
তাহলে তোমায় সবাব সামনেই চুমো খেতাম ;
তাতে তো কেউ আমাকে দোষ দিত না।
চলো, তোমায় আমার মায়ের ঘরে নিয়ে যাই ;
আর মা আমায় সব শিখিয়ে দেবেন ;
সেখানে পান করাবো তোমায়
ডালিম-রসের গন্ধসুরা।

আমার মাথার নিচে তার বাঁ হাতখানি ;
ডান হাত দিয়ে সে আমায় বেঁধেছে
আলিঙ্গনে।

জেরুজালেমের মেয়েরা, আমার গোহারি শোনো ;
যতক্ষণ না তৃপ্ত হয় আমার বল্লভ,
তোমরা শোরগোল তুলে তাকে জাগিয়ো না।

সঙ্গিনীর দল ঃ

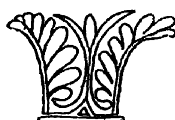
দয়িতের অঙ্গে ভর দিয়ে
চারণ-ভূমির পথে এ কে আসে ?

বর ঃ

এই সেই আপেল তরুর তল—
যেখানে আমি তোমায় জাগিয়েছিলাম।
এই সেই ঠাঁই
যেখানে তুমি তোমার মায়ের কোলে প্রথম এলে।

বধূ ঃ

আমায় তোমার বাহুর, তোমার বুকের
মোহর করে রাখো।
প্রেম-যে মৃত্যুর মতোই শক্তিমান,
কবরের মতোই নিষ্করুণ তার ঈর্ষা,
তার অঙ্গারে যে-আগুন আছে
লেলিহ তার শিখা।
শত জলধারায় নেভে না প্রেম ;
শত প্লাবনেও ডোবে না প্রেম ;
প্রেমের দায়ে যে তার সর্বস্ব খোয়াতে বসে
কে তাকে দুষবে।



জুদা হা-লেভি ॥ বিদায়

বিচ্ছেদ নিশ্চিত যদি, তবে
একটু দাঁড়াও আমি দেখি মুখখানি··

মনে রেখো ও-তোমার কামনাকল্লোল দিনগুলি
আমি মনে রাখব রাত্রি, উল্লাসশিহর সুখনিশা।

যেমন তোমার মূর্তি মিশে গেল আমার স্মরণে
রাখো অনুরোধ, করো আমাকে তোমার স্বপ্নসহচর করো
আমি-যে পারি না যেতে নিকটে তোমার।



ওগো তুমি আসবে যদি পার হয়ে স্বপ্নপারাবার—
স্রোত ছেড়ে দিক পথ বুকে তার তোমার পায়ের ছোঁয়া লেগে।

মৃত্যুও লোভন, যদি চিরনিদ্রিত আমার কানে বাজে
সোনার ঝুম্‌কোর বোল, দোলানো তোমার পেশোয়াজে...

কিংবা সে-কুশলপ্রশ্ন তোমার মুখের
বাজে কানে—
গহীন কবরে-জেগে উঠে তবে আমি
শুধাবো, 'কেমন আছ,' শুধাবো, 'আমার জন্যে কিছু আছে প্রেম ?'

জানি জানি, হৃদয়ের এ-রক্তমোচনে
রইল দুজন সাক্ষী : কপোল তোমার, ওষ্ঠাধর।
কী করে বলছ তুমি, এ তো সত্য নয় ?
ওরা-যে আমার সাক্ষী রক্তসত্যে বাঁধা,
তোমার ও-হাত আততায়ী।
কেন তুমি মৃত্যু চাও আমার, কেন-যে
আমি চাই এ-আমার আয়ুষ্কাল তোমার আয়ুতে যোগ দিতে ?
কামনাকম্পিত রাত্রে আমার চোখের ঘুম নিলে,
ভাবো কি দেবো না ভরে এ-চোখের যত ঘুম ওই দুই চোখে ?
বিদায়ের বিষ আর চুম্বনের মদ :
তিক্ত ও মধুর দুই পৃথিবীর মাঝখানে থরোথরো আমার হৃদয়।

হৃদয় আমার দিলে দলিত মথিত করে বাক্যের প্রহারে,
নিজহাতে এরপর কেটে তারে টুকরো-টুকরো করে নাও তুমি।
আর আমি দেখি ওই দন্তরুচিশোভন অধর :
যেন দুই মুক্তাপংক্তি ঢাকে দুটি রক্তাক্ত প্রবাল।
তোমার মুখের 'পরে সূর্যালোক
উজ্জ্বল সূর্যের মুখ তুমি ঢাকো তোমার রাত্রিতে
ও-তোমার কালো চুলে, মেঘে।
মসৃণ সিল্কের সাজ কারুকাজ ঢেকে আছে তোমার শরীর
তোমার দু-চোখ ঢেকে রূপ আর সম্ভ্রম ওড়না।

রূপবতীদের জানি অলংকারে সাজায় মায়েরা
আর তুমি—মহত্ত্বের মাধুর্যের আভরণ অনন্যা-যে তুমি !

কানে নেই তোমার ও-কণ্ঠস্বর, তবু যেন শুনি যেন শুনি
পদধ্বনি, ও-কার পায়ের ধ্বনি আমার বুকের মাঝখানে
গোপনে গহনে।

যেদিন আসবে তুমি, যেদিন জাগাবে তুমি তাদের
তোমাকেই ভালবেসে যারা হল বলি—
যেদিন উঠবে জেগে ফের সেই মৃত মানুষেরা—
এই দেহে সেইদিন ফিরে দিও আমার আমিকে :
যে আমি আমার নয়, যারে তুমি নিয়ে গেলে তোমার
বিদায়ক্ষণে ডেকে



চীনা





'শি চিঙ্' থেকে

অজ্ঞাত ॥ পুবদুয়ারের উইলো

তুমি বলেছিলে, 'ঘনাবে না সাঝ স্তব্ধ-দুপুর রাতে।'
শেষ ঝিকিমিকি অস্তসাক্ষী উইলোর পাতে পাতে।
ঝিল্লির রবে শিহরি শিহরি বিনিদ্র রাত কাটে।
তুমি বলেছিলে, 'অপলক চোখে উজোর হবে এ নিশি।'
হাস্নুহানার সুবাসে দীর্ঘনিশ্বাস গেছে মিশি।
জাগে শুকতারা, উর্মি ছলকে ঝলকে দীঘির ঘাটে।

*** ॥ প্রতীক্ষার গান

সব্‌জিপাতা এখনো কটুকষায়
নদীর জল গভীর, কে হবে পার,
রয়েছি চেয়ে আশায়।
নদীর জল উঠেছে, কূল ভাসায়,
একটি পাখি ডাকছে, খোঁজে জুড়ি,
রয়েছি, স্বামী, আশায়।
খেয়ার মাঝি এখনো তবু দিশায়,
যাবার যারা গিয়েছে সব চলে,
সখা, রইলাম্ আশায়।

*** ॥ মুঞ্জতৃণ

আমরা ছিলাম দুই তীরে দুটি শ্যামল মুঞ্জতৃণ,
ছোট্ট নদীটি মাঝখানে বহি চলে।
পরস্পরের পরশ তো মোরা পেলাম না কোনোদিনও
উপাড়িয়া যদি না নিত স্রোতের জলে ;
না আসিলে শীত কে বলো বাঁধিত আমাদের দুইজনে
জমাট হিমের তুহিন-ঘুমের নিবিড় আলিঙ্গনে।

*** ॥ ***

নীলাকাশে শুভ্র মেঘ ভাসে।
যেতে হবে সুদূর প্রবাসে।
বিরহবন্ধুর পথখানি।
তোমার আমার মাঝে রানী,

অন্তরায় রচিবে অচিরে
নিরুত্তর শৈলশিরে-শিরে।

বিরহীরে—করিয়ো স্মরণ,
মৃত্যু—তুমি কোরো না বরণ
হে অভিমানিনী।

* * * ॥ * * *

সারাদিন ধরে বাতাস বইছে দিশাহারা উদ্দাম।
তুমি আমার মুখে তাকাও আর হো হো হাসো।
তোমার রসিকতা লাম্পট্য, তোমার হাসিতে ব্যঙ্গের জ্বালা
আমার হৃদয় ভিতরে ভিতরে পীড়িত।

সারাদিন ধরে বাতাস বইছে ধুলোর ঘূর্ণি তুলে।
মনে হল তুমি আসছ কোমল মন।
এলে নাকো আব চলে যেতেও হল না।
তোমাকে ভেবেছি দীর্ঘ দীর্ঘকাল।

রাগে বিবর্ণ এই বাতাস আজ আর দিনটাকে
স্বচ্ছ আকাশে শেষ হতে দেবে না, এই পণ।
মেঘের পিছনে মেঘেরা ধাওয়া করছে।
নির্মম চিন্তা যত,
জেগে থাকি আজ সকরুণ গুঞ্জনে।

মেঘে মেঘে আজ আকাশ হয়েছে কালো,
সুদূর বজ্র হাঁকে।
জেগে বসে আছি, ঘুম চলে গেছে, তোমার চিন্তা যত
আমার হৃদয় ভরেছে যে বেদনায়।

*** ॥ উইলো পাতা

জানলায় বসে স্বপন দেখে যে
ভালবাসি সেই মেয়েটিরে।
শিল্প-বাহার সৌধ তাহার
আছে বটে পীত নদীতীরে;
শুধু সেইজন্যেই ভালবাসিনে সে
মেয়েটিরে,
উইলো পাতাটি তার হাত হতে
খসে পড়েছিল নদীনীরে,
তাই ভালবাসি সেই মেয়েটিরে।



বড়ো ভালবাসি পুবে হাওয়া।
পুব্ পাহাড়ের ফুলে ফুলে সাদা
পীচের সুরভি যায় পাওয়া।
শুধু সেইজন্যেই ভালবাসিনে গো
পুবে হাওয়া,
উইলো পাতাটি সে-ই এনে দিল
চলছিল যবে তরী-বাওয়া,
তাই বড়ো ভালবাসি পুবে হাওয়া।

উইলো পাতাটি বাসি ভালো।
তারি মুখে শুনি নববসন্তে
কবে ফের ধরা হবে আলো,
শুধু সেইজন্যেই পাতাটিরে নাহি
বাসি ভালো,
ফুল তোলা সূচে মোর নাম তাহে
মেয়েটি যে উৎকীর্ণালো।
তাই উইলো পাতাটি বাসি ভালো।

* * * ॥ **প্রাচীন গাথা**

ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা বছরটা তার অন্তে থামলো ;
ফড়িং আর ঝিল্লির অবিরাম করুণ আওয়াজ ;
কনকনে হাওয়ার তুমুলতা বাড়লো ;
আমার প্রেম নিয়েছে প্রব্রজ্যা,
তার গায়ে কোনো আঙ্‌রাখা নেই ;
তার নক্‌শা তোলা রেশমী কাপড়,
সে তা দান করে দিয়েছে 'লো' রমণীকে ;
আর তার শয্যাসঙ্গী,
আমাকে সে করলে নীরবে ত্যাগ ;
বড়ো রাতটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছি, একা,
স্বপ্নে যেন দেখলাম তার মুখ, মুখের আদল, আলো,
আমাদের ফেলে আসা আনন্দক্ষণ যেন
আবার কুড়িয়ে পেলাম ;

সে যেন এল তার রথে চড়ে, আর
আমাকে ধরতে দিলে বল্গা ;
আমি চাইলাম এই হাসি আর উৎসব
ধরে রাখতে,
তার হাত চেপে ধবলাম,
বললাম, নিয়ে চলো আমায় তোমার রথে ;
কিন্তু সে, আমি জানতাম, এসেছে
শুধু চলে যাবে বলেই ;
আর, অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ
মিলল না ;
হাওয়ার গতির সঙ্গে ছুটব কি করে,
আমার তো ডানা নেই ?
আমি থেমে পড়ি, কপাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়াই, কাঁদি ;
আর আমার শোক,
অশ্রুধারা হয়ে ভেজায় যুগ্মদ্বাব।

* * * ॥ কোথা সে

কোথা সে
কাটছে কাগুনি
জানি কি !
দেখিনি একদিন, যেন
গেছে তিন পূর্ণিমা,
গেছে কি !

কোথা সে
        কাটছে শন
            জানি কি !

দেখিনি একদিন, যেন
গেছে তিনটি শরৎ,
        গেছে কি !



কোথা সে
তুললো দ'না
    জানি কি !
দেখিনি একদিন, যেন
গেছে তিনটি বছর,
        গেছে কি !

সম্রাট উ তি ॥ * * *

রেশমী তার নিচোলের মৃদু-মর্মর গেছে থেমে,
আমার মর্মর-প্রাঙ্গণে ধুলো জমে,
তার খালি ঘর হিম নিস্তব্ধ,
ঝরা পাতা উড়ে উড়ে জড়ো হয় দরজার গায়ে,
সেই সুন্দরীর আকাঙ্ক্ষায়
আমার বিধুর হৃদয়কে কি করে শান্ত করি।

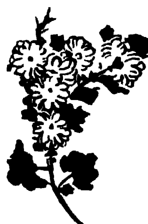
তাও য়ুয়ান-মিঙ্ ॥ সুন্দরীর প্রতি

এত রূপ এই অঙ্গে, কোনো নারী ধরেনি, যা
আর কোনো কাল,
মনে হল, সব ফেলে তোমার দিকে আসা যায়,
সমস্ত পুরুষ তা পারে
তুমি তাই।

যে সাজ পরেছ, তাতে একটি বন্ধনী,
মধ্যে বসানো প্রবাল ;
ওই প্রবালের মতো তুমি, নিটোল ; যে
লুকোনো বাগান থেকে মিষ্টি সুগন্ধ
এল, সে তুমি ;
দিনের কাজ সেরে চলেছ, কত অনায়াস,

কিন্তু তোমার মন, ও যেন সূক্ষ্মতায় বেঁধে রাখা
তার।

সময় এত দ্রুত যায়, এই আমাব
খেদ, এমন অজস্রভার, জীবন ; আর
একেক শতকে সবই ফুরায় ;
চেয়ে দেখি তুমি হাসছ, আমি ওই হাসিকে চাই, দুঃখ
ফিরে যাক।



রক্তিম গালিচা, পর্দা একপাশে টানা,
তুমি ছিলে বসে, এমন নিমগ্ন ;
সুর তুলছিলে বীণে, দ্রুত লয় ;
আর তোমার সাদা মোলায়েম আঙুলগুলো, যেন
যন্ত্রেব ওপব উড়ে উড়ে পড়ছিল ;
মণিবন্ধের ওঠাপড়ায়, তোমার পোশাকের হাতের ঘের
কেঁপে কেঁপে উঠছিল ;
মনে হল যেন এক মন্ত্রমুগ্ধ আলোড়ন ;
তোমার উজ্জ্বল চোখের তারা কোমল আলোয়
ভরে উঠেছিল ;

ভেবে পাইনে
আমার জন্যে কোন্ ভাবনা নিয়েছ, তুমি।

তখনও সুর থেমে যায়নি,
গোধূলির আলোয় ভরলো ঘর ;
আর, সুর, বিষাদমাখা সে সুর, ঘর ছেড়ে
ভাসলো বাইরে, ডালপালা অরণ্যের ভিতর, তারপর
সন্ধ্যার কুয়াশায় মিশে ভেসে গেল, আরও দূর
যেখানে পাহাড়।

তুমি একবার চোখ তুললে, তাকালে ; আবার
মসৃণ ঘাড় নামিয়ে নিলে ; যন্ত্রের তারের ওপর দিতে থাকলে
আঘাত, যে ঝংকার তখন বেজে উঠল,
তার প্রত্যেক তরঙ্গ যেন সম্মোহন,
সমস্ত স্বরগ্রাম এমন আশ্চর্য, সম্পূর্ণ, স্পষ্ট হয়ে জেগে রইল।

আমাকে ঘিরে ফেলেছে ওই সঙ্গীত, তার উতরোল,
আমি আর পারবো না, কথা বলে উঠবো আমি, এখনই ;
প্রণয়ীর মতো বসবো পরস্পর, হাঁটুতে হাঁটু লেগে, কাঁপবো,
আর, উজাড় করে দিয়ে যাবো হৃদয় ;

তবু বলিনি, দ্বিধা,
ভাববে দুঃসাহস ;
তবু চিরকাল এমনি যদি কেটে
যায়, কোন্ দৈব এসে জানাবে তোমাকে
আমার প্রেম ; তার আগে
পৌঁছবে প্রতিদ্বন্দ্বী যারা, আমার আগেই ; আমি

নিজেকে পারি না বুঝতে, নিজেকে ধিক্কার দিই, ক্ষুব্ধ হই
নিজের ওপর ; আর মুহূর্তে শতবার
মন বদলাই।

যদি পারতাম
তোমার পোশাকের ঘের হতাম, ছুঁয়ে
থাকতাম তোমার ঘাড় ; তাহলে পেতাম
তোমার চুলের গন্ধ ; কিন্তু তারপর রাত্রি,
আসতো শয়নের সময়, এক পাশে খুলে রেখে
তুমি বিছানায় যেতে ; পড়ে থাকতাম,
শরতের দীর্ঘ রাত্রি কাটাতাম অসহ্য জ্বালায়,
কখন, আবাব উঠে শরীরে জড়াতে।

কিংবা যদি পারতাম
হতাম ও-অঙ্গের ওড়না ;
ঘুরে ঘুরে পড়তাম শরীরের এপাশ-ওপাশ,
বেড় দিয়ে ধরতাম কটিতট ; কী আশ্চর্য তোমার কটি ;
কিন্তু, ঋতু বদলে যেত,
আর, তুমি পছন্দ করতে অন্য একটা রঙ,
আমি থাকতাম পড়ে।

আহা, যদি হওয়া যেত
তোমার চুলের প্রসাধন,
চিরুনিতে জড়াতে, ফেলে রাখতে কাঁধের ওপর,
তবু, স্নানের বেলা তাও
ধুয়ে যেত।

হয়তো আমি
হতে পারতাম, তোমার ভুরুর রেখা,
চোখের কাজল ;
উঠতাম-পড়তাম তোমার প্রত্যেক চাউনিতে ;
তবু, তাও মুছে ফেলতে
অন্য কোনো পরাগ-বাহারে, মুখ-প্রসাধনে,
আবার, সন্ধ্যায়।

হতে পারতাম শরকাঠি, নলখাগড়া ; তা দিয়ে
বুনতো শীতলপাটি ; গ্রীষ্মের আনচান রাত্রিতে
তার ওপব এলাতে দেহ ; ক্লান্ত, কোমল সেই দেহ
ধরে রইতাম ; তবু আসতো ফের শীত, হিম পড়তো,
তুমি তখন গরম কম্বল বেছে নিতে।

যদি হয়ে যাই,
একজোড়া নরম বিনামা, যা গলাবে পায়ে ;
চলবো-ফিরবো, উঠবো-বসবো, সবই তোমার সঙ্গে, সব ;
তবু, শূন্য-প্রহর আসবে,
তোমার শোবার ঘরে, একপাশে আমি
ঠাঁই করে নেবো, সংকুচিত ;
তুমি শোবে বিছানায়।

আমি তবে হয়ে যাবো তোমার একান্ত
ছায়া, পিছনে পিছনে ফিরবো সমস্ত সময় ধরে,
তুমি যেখানে যাবে, কিংবা এলে,
তোমার আড়ালে রইবো।

তবু আমি ঘৃণা করবো নিজেকে, যখন
তোমাকে ছাড়তে হবে, তুমি যখন দাঁড়াবে
দীর্ঘ কোনো গাছের ছায়ায়,
আমি সরে রইবো।



হয়তো আমি হয়ে যাবো
তোমার ঘরের বাতি ; রাত্রির নির্জন প্রহর ভরে
তোমার মুখে আলোকিত হবো ;
শুধু ভোর জেগে এলে
রোদ্দুরে একটু একটু করে মুছে যাবো আমি,
মাত্র এই-ই।

যদি বা হতামই আমি
বাঁশের চিকণ পাতা, তাহলে হয়তো
তোমার নরম হাতে উঠতাম ;
হতাম বীজনের পাখা ;

হাওয়াকে করতাম স্নিগ্ধ, তোমার
ঘরের বাতাস, তবু, আসতো একদিন
ফুরফুরে শরৎ, আর আমার সেবার
শেষ, ফেলে রেখে দিতে।

এমন হতেও পারতো,
হতাম বনের সেগুন ;
সে কাঠে বানাতো যন্ত্র, সারঙ্ কিংবা বীণ ;
তাহলে তোমার কোলের ওপরে পড়ে রইতাম,
যখন বাজাতে, আমায় ;
কিছুক্ষণ, তারপর হয়তো উদাস হয়ে যেতে,
বাজনা থামিয়ে
আমাকে নামিয়ে রেখে উঠে যেতে
চলে।

সব অসম্ভব ;
তবু আমি জেনে শুনে, ভাবি
এত কামনা, তোমাকে চেয়ে, আমি
সব পারি।

কেউ নেই, কোনো কথা নেই, কাকে
বলি এ মত্ত বিলাপ ; আমি একা ঘুরি
অরণ্যে ফুলের মধ্যে,
ঋজু পাইনের নিচে ;
যদি দেখা হয়ে যায়, এইখানে
বনানীর ছায়ার আড়ালে,
যদি দেখা হয় ;

বুকের মধ্যে যে-সব কথা ঠেলে উঠেছে,
তাহলে
তোমাকে সব শোনাতাম আমি।

এও এক অসম্ভব সাধ, আমি জানি,
আমার সমস্ত সাধ তুমি, খুঁজি তাই
অন্ধউন্মাদের মতো, ধরেছি কামিজ
হাতে, সূর্যাস্তে ফেলেছি দীর্ঘশ্বাস,
কোন্ পথ কোথায় গিয়েছে, জানি না ;
আমার ঠিকানা নেই, মুখে জ্বালা, তিক্ত স্বাদ, জ্বালা,
আমি ঘুরছি একা।



একটি একটি করে পাতা ঝরতে থাকলো ; ঠাণ্ডা
হাওয়ার আঘাত ; সূর্য ডুবে গেল
দীর্ঘ, দীর্ঘতর ছায়া ফেলে ফেলে ;
চাঁদ উঠে এল মেঘের ওপর, মেঘ

ঢেকে ফেললো আলো, চাঁদ
এ এক লুকোচুরি চললো, খেলা ;
শেষ পাখি ফিরে গেল নীড়ে ;
এখন শব্দ, শুনছি শুধু অরণ্যের, বন্য-জীবনের,
জন্তুর মৈথুন শব্দ ; এই
শারদীয় কাল, গভীর বিষাদে রাখলে
ঢেকে ; এক বারো মাস
আশা আর বঞ্চনায় হারালাম, আমি।

আমার সমস্ত স্বপ্নে তোমাকেই খুঁজে ফিরছি
আমি ;
আমি যেন পরিত্যক্ত নৌকো এক, হাল নেই, ভেসে গেছি
স্রোতে ; একটি মানুষ
যে দাঁড়িয়েছে একা এক পাহাড়ের
খাড়াইয়ের ধারে, সামনে তার বিরাট পাতাল।

তারপর বিনিদ্রার প্রহরগুলি কাটলো ; আস্তে
আস্তে আলো ফোটে, একটা ঠাণ্ডা
উত্তুরে হাওয়া দেয় ;
আমার ভাবনাগুলো জটবদ্ধ হয়ে
গেছে ; আমি উঠি, গায়েতে জামা চড়াই,
ভোরের প্রতীক্ষা করে থাকি।

সারা রাত হিম পড়ে পড়ে
বনের ঘুরপথ সব সঙ্গ-চুকোনো তারায় যেন
ছিটিয়ে রয়েছে ;

ডানার পালকে ঘাড় গুঁজে
তখনও মোরগ, তার ঘুমে ;
কোথায় চলেছে বিষণ্ণ বাঁশির সুর
বেজে
উঠতি হাওয়ায় তাও স্পষ্ট শোনা যায়।

যদি পারতাম আমি, আকাশের
পেঁজা পেঁজা মেঘেদের ডেকে,
বলতাম এ কাহিনী, এই প্রেম, এ বিরহ
তোমার উদ্দেশে নিয়ে যেতে ;



কিন্তু, তারাও এখন স্থির, কিছুক্ষণ, তারপর
ধীরে ধীরে তারা গেল ভেসে ;
ফের আমি একা, আমার ভাবনা নিয়ে ;
তোমার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে,
যে তুমি রয়েছ দূরে, রয়ে গেছ দূরে,
আমার মুহূর্ত থেকে, কতদূর।

আস্থক, আস্থক স্বচ্ছ হাওয়া, আমার
দুঃখকে উড়িয়ে নিক ; আমার ভালবাসা
তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় চেপে তোমার দিকে
ফিরুক ;
খোলা অপার দেশে আমি আসছি
আসবো, থেকো, আমার ভালবাসা, আসবো
শাওনানের গান গেয়ে গেয়ে, যা কিছু সব
উজাড় করে-—তোমারই জন্যে, দিতে, আমি
রয়েছি চিরকাল।



ওয়াং সেং-জু ॥ দুঃসহ দুঃখ

চাঁদের নৌকা ভাসিয়া চলেছে শৈল শিখর ’পরে
প্রদীপের আলো মরে ;
অতীত অযুত বসন্ত আজি বুকে মোর হা হা করে
আর, আঁখি জলে ভরে।
মরমের ব্যথা বুঝিলে না, বঁধু ! এ দুখ রাখিতে ঠাঁই
নাই গো কোথাও নাই।

চাঙ্ চিউ-লিঙ্ ॥ চাঁদনীতে প্রেম

সুবর্ণ চাঁদ উঠলো
জলের উপর ; ঘোর নীল
রাতের পর্দা ঢাকলো আকাশ ;
তুমি আর আমি রয়ে গেছি একই নীলিমার নিচে,
যদিও সে বহুদূর ; আর আমি
দীর্ঘরাত্রির মধ্যে ধৈর্যের প্রহর গুনছি শুধু।
একটি আকাশ, রাত্রি, চাঁদ , আমি ভাবি
একটিই কথা, শুধু তার।



জ্যোৎস্নার আলো পড়ে, আমি তার অপচয় ঘোচাতে
দিই, বাতি নিভিয়ে দিই, আর পায়ে পায়ে
বাইরে দাঁড়াই পদচারণায়, শিশির
আমার মুখ ভিজিয়ে দিয়েছে ; আমি মুঠো করে ধরে ফেলবো
এক মুঠো জ্যোৎস্না, পাঠাবো
তার কাছে ; তবু পারি না, পারবো না যা, তবে
ফিরে যাই শয্যায়, অবশেষে যাই ঘুমে
স্বপ্ন দেখি, আর
যেদিন সে আসবে এই ঘরে পরিণীতা।

লি পো ॥ পদাবলী

নির্মল শরতের হাওয়া,
অপরূপ শরতের চাঁদ।
ঝরা পাতার দল স্তূপাকার ছত্রাকার,
তুষার-হিম দাঁড়কাক বাসা ছেড়ে উড়ছে।
তোমারই স্বপ্ন দেখছি—কখন দেখতে পাব তোমাকে ?
এই রাতে হৃদয় বেদনায় ভরে উঠছে।

—কে

যখন সে-রূপসী এখানে ছিল, ফুলে ফুলে ঘরদোর
সাজানো ছিল ;
যখন সে-রূপসী চলে গেল, শূন্য শয্যাই পড়ে রইল শুধু।
শয্যায় নক্‌শা তোলা লেপটা ভাঁজকরা, কেউ ছোঁয় না।
সেদিন থেকে তিন তিনটে বছর এক সুগন্ধ হানা দিয়ে ফিরছে।

সুগন্ধ চিরকালই ঘুরে মরে,
সে কিন্তু হারিয়ে রইল চিরকাল।
কী গভীর আর্তিতে শরৎ এল, হলদে পাতাগুলো ঝরছে,
সাদা শিশিরের ফোঁটায় ফোঁটায়
চিকচিকে সবুজ শ্যাওলা ভিজে উঠছে।

একটি বন্ধুর কথা

আমার ছাঁটা চুল ছিল খাটো, তাতে কপাল ঢাকতো না।
আমি দরজার সামনে খেলা করছিলুম, তুলছিলুম ফুল।
তুমি এলে আমার প্রিয়, বাঁশের খেলা-ঘোড়ায় চড়ে
কাঁচা কুল ছড়াতে ছড়াতে।

চাঁংকানের গলিতে আমরা থাকতুম কাছে কাছে।
আমার বয়স ছিল অল্প, মন ছিল আনন্দে ভরা।
তোমার সঙ্গে বিয়ে হল যখন আমি চোদ্দয় পড়লুম।
এত লজ্জা ছিল যে হাসতে সাহস হত না,
অন্ধকার কোণে থাকতুম মাথা হেঁট করে,
তুমি হাজারবার ডাকলেও মুখ ফেরাতুম না,
পনের বছরে পড়তে আমার ভুরুকুটি গেল ঘুচে,
আমি হাসলুম।

আমি যখন ষোলো তুমি গেলে দূর প্রবাসে—
চ্যুটাঙের গিরিপথে, ঘূর্ণিজল আর পাথরের ঢিবির ভিতর দিয়ে।
পঞ্চম মাস এল, আমার আর সহ্য হয় না।
আমাদের দরজার সামনে রাস্তা দিয়ে তোমাকে যেতে দেখেছিলুম,
সেখানে তোমার পায়ের চিহ্ন সবুজ শ্যাওলায় চাপা পড়ল—
সে শ্যাওলা এত ঘন যে ঝাঁট দিয়ে সাফ করা যায় না।
অবশেষে শরতের প্রথম হাওয়ায় তার উপরে জমে উঠল ঝরা পাতা।

এখন অষ্টম মাস, হলদে প্রজাপতিগুলো
আমাদের পশ্চিম-বাগানের ঘাসের উপর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।
আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে, ভয় হয় পাছে আমার রূপ যায়
ম্লান হয়ে

ওগো, যখন তিনটে জেলা পার হয়ে তুমি ফিরবে
আগে থাকতে আমাকে খবর পাঠাতে ভুলো না।
চাংফেংশার দীর্ঘপথ বেয়ে আমি আসব, তোমার সঙ্গে দেখা হবে।
দূর বলে একটুও ভয় করব না।

বসন্ত ভাবনা

ইয়ানের ঘাস অসম সবুজ
এখানে ছিনে, তুঁতের ডালে নীলাভা,
এই তো সময়—
গৃহমুখী হয়ে উঠেছে তোমার মন,
আমারও প্রহর জাগর, বিবশ বিক্ষত
তোমার ভাবনায়।

পথে বসন্ত বায়ে একই সংবাদ !
এ অধীর কাল
কী করে কাটাবে তুমি
তাঁবুতে নির্জনে ?

নির্বাসিতের চিঠি

মেঘের 'পরে মেঘ—তারও ওপারে য়েহ্-লাঙে বসে কাঁদি
তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।
চাঁদের আলোয় ধোয়া এই আস্তানায় ক্বচিৎ কখনো খবর আসে।
তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি বসন্তে বুনো রাজহাঁসগুলো উড়ে চলে উত্তরে,
এখন তারা দক্ষিণে ফিরলো—য়ুচাঙ্ থেকে কোনো চিঠি আসে না।

তু ফু ।। জ্যোৎস্নায় রাত্রি

ফুচউ-এর এই রাত্রি, এখনই
জ্যোৎস্নার জোয়ারে ভরে যাবে ; আর
সে উঠে দাঁড়াবে চেয়ে স্থির ওই দিকে ;
ছেলেরা পড়েছে ঢলে ঘুমে, শান্ত ; স্বপ্নেও যে যার,
স্বপ্নেও ভাববে না তারা, শিশু-সরলতায়
চাংকানে পুরনো বাড়ি, যা রইল পড়ে।

সে উঠবে জ্যোৎস্নায় ; তার কালো চুলে শরৎ-রাত্রির
শিশির ঝরবে ভিজে, তার শ্বেত-
মর্মরের মতো বাহু শিরশির, হিম-কাঁপুনিতে ;
কখন, কখন, আহা, দাঁড়াব জানলায় ফের পাশাপাশি ;
জ্যোৎস্নার জোয়ারে
চোখ মেলে, চেয়ে ; সে-চোখ ভরাবে অশ্রুভার।

পাই চু-য়ি ।। নৌকোয় একরাত

জলের কিনারে,
বৃষ্টির পর ঃ
নিসর্গের ছায়া পড়েছে—
স্পষ্ট ; সাঁকোর তলা বেয়ে
এল শীতল হাওয়া, স্নিগ্ধতা।

দুইটি সারস আর একখানি নৌকো ,
আমরা দুইজন, এখানে অভিন্ন,
পড়ন্ত চাঁদের পাণ্ডু-জ্যোৎস্নার ভিতর।

তু মু ॥ বিদায়ের গান

এক

এত সুন্দর, আর
আশ্চর্য তোমার দেহ ;
যেন প্রথম বসন্তে দ্রাক্ষালতা
নুয়ে পড়েছে ; এখন
ইয়াঙ-চাউ-এ হাওয়া —
উষ্ণ হাওয়া বইছে, দরোজা থেকে
পর্দা উড়িয়ে সমস্ত পথে
গৃহে ; এত দৃশ্য, তবু
তোমার মতো আশ্চর্য
কেউ নয় ।

দুই

ভালবাসা, যা নিখাদ
কী দিয়ে তা লুকোবে ?
ঠোঁটের আগায় হাসিকে
যত না আলতো করেই বুলিয়ে রাখি,
শেষগ্রাস মুখে তোলবার সময় ।

বাতিদানে মোম পুড়ে চলেছে ;
আর, ওরাও
জানলো আমাদের, বুকের
তোলপাড়, চোখের কান্না
যতক্ষণ না, ভোরের আলো ফুটলো ।

লি ছিঙ্-চাও ॥ একাকী

আলোকিত জানালার ধারে
কে বসে একাকী ?
ছায়া আর আমি, শুধু আমরা দুজনে।
জ্বলে জ্বলে দীপ নিভে যায় ঃ অন্ধকার !
ছায়াও ছেড়ে যায় যে আমাকে।
হায় রে !
আমি হতভাগিনী !

ফোটাফুল ভেসে চলে

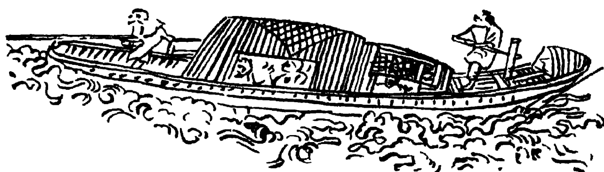
রক্তাভ পদ্মের সুগন্ধ মিইয়ে আসে, পান্না-সবুজ নলখাগড়ায়
শরতের ইঙ্গিত।
রেশমের অঙ্গরাখা নিঃসাড়ে খুলে রাখি,
তারপর নৌকোয় উঠে বসি একা একা।
মেঘের ভিতর থেকে কে পাঠায় পত্র-লিপি ?
বার্তা নিয়ে হংসদূত যখন ফিরে আসে, অলিন্দে
চাঁদের আলো বান ডাকায়।

ফোটাফুল ভেসে চলে, কলকল জলের ধারা।
হৃদয়ের সেই একই আর্তি,
কিন্তু বাসা বাঁধলো সে দু-জায়গায়।
কোনো উপায় নেই এ আর্তিকে হটাবার :
ভুরুর কুঞ্চন থেকে যদি বা হটে,
বাসা বাঁধে বুকের মধ্যে।

ওয়াং হো-চিঙ্ ॥ প্রেম

মজ্জায় নিহিত এই প্রেম
অস্থিতে অস্থিতে ;
ধোয়া যায় না, ধোয়া যায় না,
অসহ প্রণয়-পীড়া, এই প্রেম
নিরাময় করব কী দিয়ে ?

দুজন, আমরা দুজন—যখন আবার
মিলবার লগ্ন আসবে, সেই সুদিনে
আমি আর তুমি
আসবো ফিরে, শুধু পরস্পরের দিকে, শুধু,
আনন্দসুন্দর ফিরবে আবার।



মিঙ্-যুগ

লো হেঙ্-হ্সিন্ ।। সৈনিক-বন্ধুর গান

গত বছরে সাঙ্কানের নদীর ধার
তুমি গিয়েছ যুদ্ধে,
এ বছর চিয়াও হো, সম্মুখসমরে তুমি,
তোমার চিঠি এল, এত ঠিকানা বদল করে
এত ঠিকানা বয়ে
স্বপ্নেও ভাববো কী যে কোথায় মিলবে দেখা ?



ওয়াং উ ।। প্রেমের গান

হাজার ভরি সোনা দিলে,
একখণ্ড নিকষ মরকত কিনি ; তারপর
আরও হাজার ভরি,
এক জহুরী যে তার দক্ষ হাতে
পাথর কেটে গড়বে, কুশলী-জোড়ে
দুইটিই অঙ্গুরী ।

দেহ আমার, আমি তার মর্ম জানি,
হৃদয় তোমার, তুমিই তার মর্ম বোঝো ;
আমার সকল আশা ধন্য করে
ফুটবে, শুধুই ভাবি
ফুটুক, ফুটুক শেষের প্রণয়, আশা
যেমন এখন, তেমনি মহান
প্রথম প্রেম।

অজ্ঞাত   * * *

মধুমতী স্রোতেও তো করিছে বিরাজ
এই শুক্লনিশা আজ
হেথা যার স্বপন চুমায়
অন্তরীপে নিস্তরঙ্গ সমুদ্র ঘুমায়।

কী ভাবে রয়েছে সেথা আত্মীয়স্বজন !

বিজন প্রদোষে ক্ষণে-ক্ষণ
বন্য মরালের কণ্ঠে কণ্ঠে ওঠে সেই ডাক
জনার-ভুট্টার ক্ষেত নিষুপ্ত নির্বাক্।
অঙ্গনে চাঁদের আলো ফুটে।
একা বালাবধূ মোর গিরিপথে উঠে।



গ্রীক





সাপ্‌ফো ॥ আফ্রোদিতের উদ্দেশে

হে অমৃতা প্রণয়ের দেবী,
জেয়ুস্‌-নন্দিনী তুমি, বহুবর্ণে সমারূঢ়া,
তুমি চতুরালির সূত্র বোনো।
দেবী, আমি প্রার্থনা করি
যন্ত্রণা দিয়ে, বেদনা দিয়ে তুমি আমার হৃদয় ভেঙো না।

এসো এখানে,
যদি পূর্বে কখনও আমার কণ্ঠ দূর থেকে শুনে
তুমি সাড়া দিয়েছিলে,
তোমার পিতার সোনালী রাজ্য থেকে
তুমি নেমে এসেছিলে,
তাহলে এখানে এসো।

ইথার-মণ্ডলের মধ্য দিয়ে নন্দন-অবতীর্ণা
তুমি এসেছিলে উদ্যত রথে,
তোমার হংস-যুগলের দৃঢ়-পক্ষের ক্ষিপ্র সহজ গতিবাহিতা,
তামসী বসুন্ধরায়।

সুধন্যা, দ্রুতই তুমি সেদিন এসেছিলে,
তোমার অমর আননের উদ্ভাসিত হাস্যে
ধীরে প্রশ্ন করেছিলে, আমার কি হয়েছে,
কেন তোমাকে ডাকলাম,

এবং সে কী বস্তু, আমার এত ঈপ্সিত,
আমার উন্মাদ হৃদয় কি চায়।
'এখন কোন্ নারীকে আমি তোমার প্রেমে প্রলুব্ধ করবো ?
সাপ্‌ফো, সে কে, যে তোমাকে এত ব্যথা দেয় ?

বর্তমানের পলাতকা আশু অনুগতা রূপে আসবে,
যদিও সে এখন দানে ঘৃণা জাগায়, তাকে দিতেই হবে,
যদি সেই নারী এখন বিমুখী থাকে,
তবুও সে ভালবাসবে
অনিচ্ছায় হোক না কেন।'

এসো আমার কাছে,
আমার নিষ্ঠুর দুঃখ মুক্ত করো,
আমার অমরাত্মা যে সম্পাদনা চায়,
তুমি আমার জন্য সম্পাদনা করো,
তুমি স্বয়ং আমার সহকারী হও।

সঙ্গিনীর প্রতি

হিরণ্ময় দেবতার শ্রেষ্ঠ সে সাপ্‌ফোর কাছে,
আনন্দিত যে তোমার পার্শ্ব-সমাসীন,
আহা, কত কাছ থেকে শোনে সে রূপালী
তোমার বচন, প্রেমে গদ্‌গদ্‌ হাসি !

তাইতে হৃৎপিণ্ড বন্য আমার হৃদয়ে—
মুহূর্তেও যদি দেখা পাই,
কণ্ঠ অবরুদ্ধ আর রসনা ভঙ্গুর,
সমগ্র শরীর ব্যাপ্ত মজ্জামাংস নিচে
লেলিহান অদৃশ্য অনল।



চোখে যেন ঘন রাত্রি,
সমুদ্রগর্জন কানে, স্বেদের বর্ষণ,
থরো থরো প্রতি অঙ্গ কম্পন-বিহ্বল।
দুর্বার অধিক আমি হই বর্ণহীন
মৃত্যুর শঙ্কিল গ্রাসে,
যেন মূর্ছা আসে,
প্রেমের ক্ষুধায় লীন।

প্রেম

প্রেম সে পাহাড়ী ঝড় ওকের চূড়ায়
বিকম্পিত শাখাপত্র করেছে আমায়।

একক শয়নে

চাঁদ চলে গেছে,
কৃত্তিকা গেল,
মধ্যরাতি।
প্রহর যায়,
প্রহর যায়,
একেলা কাটাই সঙ্গীহীন।

উন্মনা

মাগো, আমার মন বসে না
কাট্‌না নিয়ে থাকতে ঘরে ;
মন আইঢাই স্বস্তি না পাই
বুকের ভিতর কেমন করে।
কালকে যারে দেখেছিলাম
তারেই নয়ন খুঁজে মরে ;
একটি বারের চোখের দেখায়
পরাণ কি গো এম্‌নি করে।

প্রেমের বেদনা

আবার ভালবাসা কাঁদায় মোরে,
অমৃত এনেছে সে তিক্তে ভরে ;
দুখের নিধি সম পরাণ প্রিয়তম,
বেঁধেছে সে আমায় ফুলের ডোরে,—
বেঁধেছে সূচীময় ফুলের ডোরে।
এ কী গো ভালবাসা ঘটালে জ্বালা ?
পরালে গলে মোর কেমন মালা ?
ছিঁড়িতে নারি তায়, বহিতে প্রাণ যায়,
করিবি কি বা হায় মুগুধা বালা,
দোলায়ে দিল গলে কিসের মালা।



প্লাতোন ॥ আপেল

একটি আপেল আমি, প্রেমিক তোমার প্রক্ষিপ্ত করলো যাকে,
প্রেয়সী জান্‌থিপ্‌পী, তুমি করো আত্মদান অতএব তাকে,
তুমি আমি ধ্বংসের অধীন।

আরকেয়ানাসা-র উদ্দেশে

বিজয়ী মন্মথ বসে বলিত ললাটে যেই আরকেয়ানাসার
তাহারি উদ্দেশে আমি আনুগত্য দিলাম আমার।
যৌবনের অপরাহ্ন যদি হয় এত সমুজ্জ্বল,
জ্যোতির মধ্যাহ্নে দ্রষ্টা পেয়েছো কি শিখার অনল?



আস্‌ক্লেপিয়াদেস ॥ বৃষ্টির দেবতাকে

রাত্রি ভর বৃষ্টি আর আবর্তিত উত্তুরে হাওয়া,
সুরা আর হোঁচট্‌-খাওয়া নৈঃসঙ্গ,
আমার সুন্দর প্রিয় মোস্‌খোস্‌!
আমি আহ্বান করি·········
(শ্রান্ত পায়ে চলো, চলো,
দীর্ঘপথের কোথাও বন্ধুর দরজা নেই···)
আর্তস্বরে ডাকি
বৃষ্টির ধারাসিক্ত আমি:
হে জেয়ুস, শেষ নেই?
সৌম্য হও দেবতা, একদিন তুমিও কি ভালবাসোনি?

প্রেম-মাধুর্য

নিদাঘে তুষার মধু-তৃষিত-অধরে,
নাবিকের চোখে মধু উদীচী-শিখর,
বসন্তের বার্তাবহ ঃ
মধু থেকে মধুতর
প্রেমিক যুগল শয়নে নিকট যদি এক আচ্ছাদনে,
পরিণয়-দেবতার সম্মানে তৎপর।

নায়িকার প্রতি

আমাকে ফেরাও তুমি কোন্ ভরসায় ?
রসাতলে, শোনো প্রিয়া, অদৃশ্য মিথুন,
মাটি ছাড়া প্রেম নাই, শুধু দেহী জানে
রতির রভসকলা—
কিন্তু অধোদেশে
হায় বৈতরণীকূলে, সতর্কা কুমারী,
শুধু ভস্ম ধুলো হবে যুগ্মের সঙ্গম।

অজ্ঞাত ॥ * * *

সুবাস যে তার নয়—তোমারি সুবাস
সুরভিত গন্ধসার পাঠাই তোমায়,
সম্মান তোমাকে নয়, সুরভিকে শুধু ;
তুমি যে তুমিই—তুমি সৌরভ সুরভি।

মেলেয়াগেরোস ॥ তার কণ্ঠ

শপথ আমি করছি, প্রেমের শপথ করি আমি—
হিরণ্ময় সূর্য যিনি বাজান শুভ বীণা,
হেলিওদোরার কণ্ঠ আমি মধুরতর মানি।

হেলিওদোরাকে

পানপাত্র পূর্ণ করো,
আরবার বলো, বারবার, আরবার—
ওগো হেলিওদোরা!
বলো, আর শুধু তার মধুক্ষরা নাম
আসবে মিলিয়ে ধরো।
বিগত দিনের বাসী, কিবা ক্ষতি বলো,
এনে দাও মালা তারি সৌরভবিহ্বল,
যেন অঙ্গে পাই সে স্মরণে।
চেয়ে দেখো, কেঁদে মরে প্রেমের গোলাপ,
জেনে, হায়, সুদূরে সে—নাই আলিঙ্গনে।

পানপাত্র

জেনোফিলার কৌতুকী অধর
এই পেয়ালা স্পর্শ করেছে,
সে-অধর প্রেমের মধুময় জাল।

আহা, কী তীব্র সে সুখ
যদি সে আমার মুখে মুখ রাখতো,
যদি সে সুদীর্ঘ চুমুকে
আমার সত্তার শেষ পর্যন্ত পান করতো !



একাকী রাত্রি

হায় রাত্রি, হেলিওদোরার প্রেমে হায় বিনিদ্র বিক্ষোভ,
তৃষ্ণা জাগরূক !
হায় চোখ, অশ্রুতপ্ত ; সিত প্রভাতের
বিলম্বিত যামে।
সেও কি একাকী জাগে ?
সেও কি স্বপ্নে পায় আমার চুম্বন স্বাদ ?
আমার স্বপ্নকে সে কি চুম্বনে উৎসুক
পাশ ফেরে ?
অথবা নূতন প্রেমকে, নবতর খেলাকে চুম্বনে ?
হে প্রদীপ, বাধা দিও !
দেখো না এমন কিছু !
আমি কি আসিনি রেখে তোমাকেই তার প্রহরায় ?

শুকতারাকে

শুকতারা তুমি প্রেমের শত্রু।
এই রাতে সে তার চাদরের উষ্ণতায় মগ্ন,
এই রাতে পৃথিবী পরিক্রমা কী অলস তোমার !
কিন্তু, হে নক্ষত্র, তুমি কী দ্রুতই না আসতে
আমার তন্বীপ্রিয়া আমার দুইবাহুর বেষ্টনে
সুপ্ত থাকতে,
আমাদের শিয়রে জ্যোতিবর্ষণের হাস্যে
আমাদের ক্ষতি দেখে !

শুকতারা তুমি প্রেমের শত্রু !

ফিলোদেমস্ ॥ তিরস্কার

তাহলে আমি তোমার 'লক্ষ্মী মেয়ে'।
তোমার চোখের জল বলে তাই,
তোমার হাতের চালনাকৌশল বলে তাই।
তুমি যথারীতি ঈর্ষিত,
তোমার চুমো বলে, তুমি জানো তুমি কি চাও
আমি আরও বিভ্রান্ত হই, তাই,
যখন ফিসফিসিয়ে বলি, 'এই তো আমি, গ্রহণ করো, এসো।'
তুমি ইতিউতি চাও, কাশো এবং অধিবেশন
স্থগিত রাখো
অনির্দিষ্ট কালের জন্যে।
তুমি কি প্রেমিক, না রাষ্ট্র-সভার সদস্য ?

কাল্লিমাখস্ ॥ প্রেমিক জেয়ুস

ঘৃণা করে যদি সে আমাকে
তবে তুমি, হে জেয়ুস্, ঘৃণা কোরো তাকে।
থেয়োক্রেতোস্, থেয়োক্রেতোস আমার,
অপরূপ শ্যাম কিবা দেহ—
ঘৃণা কোরো তাকে
ঘৃণা করে যত সে আমাকে
চতুর্গুণ ঘৃণা কোরো তাকে।

দেবতা জেয়ুস, আমি করেছি শপথ
স্বর্ণ কেশ গান্নুমেদে-নামে,
তোমারও যৌবনে তুমি করেছঁ প্রণয়—
আর কথা নয়!



আগাথিয়াস ॥ কথোপকথন

ক ঃ ভয়াবহ দীর্ঘশ্বাস কেন ?

খ ঃ প্রণয়ে পড়েছি আমি।

ক ঃ নারী কি নরের সঙ্গে ?

খ ঃ নারীর সঙ্গে !

ক ঃ মনোহারিকা ?

খ ঃ তাই-তো মনে হয়।

ক ঃ কোথায় দেখলে তাকে ?

খ ঃ গতরাত্রে ভোজের আসরে।

ক ঃ বোঝা গেল। তোমার আশা আছে ভাবছো না কি ?

খ ঃ আমি স্থিরনিশ্চিত ঃ কিন্তু
এটা গুপ্ত রাখতে হবে, বন্ধু।

ক ঃ ওহো। তাহলে বলছো
তুমি চাও না পবিত্র
বিবাহ ?

খ ঃ তা নয় ঠিক। আমি বলছি
আমার গণনায় এসেছে কানাকড়ি নেই তার জগতে।

ক ঃ তোমার গণনায় এসেছে !—
মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদী, তুমি প্রেমে পড়োনি !
প্রেমের শরাহত নির্বোধ হৃদয়
তার পাটীগণিত ভুলে যায় !

চাতকের দল

আমার সকল রাত্রি ছিল নিদ্রাহীন,
উষায় এবার
তোমরা আনলে অশ্রু দু-চোখে আবার
মুখর হে চাতকের দল,
চোখ তাই হল দৃষ্টিহীন।
পলাতকা সুস্নিগ্ধ বিশ্রাম।



তবুও হৃদয়ে স্থায়ী রোদান্থে যে জাগে।
স্তব্ধ হও বাচালের দল,
ফিলোমেলা-জিহ্বাচ্ছেদ করেছি কি আমি ?
চলে যাও পর্বতচূড়ায়,
চলে যাও পাহাড়ে বাসায়
চিত্রপুচ্ছ সে পাখির—
সেখানে ইতুলোস্-শোকে হও গে অধীর।
আমাকে ঘুমোতে দাও,
যেন আসে পথিক স্বপন
আমার শরীর ব্যেপে আনে আলিঙ্গন
সামান্য সময় তরে বাহু রোদান্থের।

অজ্ঞাত ॥ * * *

সঙ্গী, তুমি ধরো আমার মালা।

রাত্রি কালো, দীর্ঘ পথ—
পূর্ণ এবং দিব্য মাতাল আমি,
তবু আমি যাবোই যাবো
থেমিসনের গৃহে ;
বাতায়নের তলায় গাইব আমার গান
এগিয়ে দেবার নেই প্রয়োজন,
পদস্খলন হলেও
প্রেমের গতির স্থির প্রদীপটি
জেনো তাকেই তবু।



পলাস্ সাইলেনতিয়্যারিয়াস ॥ তান্তালস্

মুখে মুখ যুক্ত আলিঙ্গনে, নগ্ন পয়োধর
বিন্যস্ত আমার হাতে।
উত্তাপ আমার
গভীর মন্থন-মগ্ন রূপালী প্রান্তর
কণ্ঠে তার।

তারপর ?   আর নয়,
শয়ন-সঙ্গম সে দেয় না আমাকে।
অর্ধেক শরীর সে দিয়েছে প্রেমকে,
অর্ধেক দিয়েছে বিমৃষ্যকারিতায় ;
তুই যোজকের মধ্যে, হায়, আমি মরি !

শঙ্কাশ্রু

সুমধুর হাসি প্রিয়ার আমার, মধুর তাহার চোখের জল
অঝোর নয়ন বহে অকারণ, কত কথা তাতে লুকায় বল্।
কামনা-নিথর গত রজনীতে আমার বক্ষ-মিলন-লীনা
সুচির সময় কণ্ঠলগ্না বহায় অশ্রু কারণ বিনা।
ক্রন্দনময় সেই ঠোঁট চুমি, কত আগ্রহে মদিরা পিয়া,
কামনাবদ্ধ চুম্বিতাধরে অশ্রু ঝরায় আমার প্রিয়া।
কেন এ অশ্রু ? যতই শুধাই, মিলনকালে এ বিরহ-ধারা ?
'তুমি ছেড়ে যাবে, এই ভয়ে কাঁদি, পুরুষের রীতি ভরসা ছাড়া।'

রুফিনাস্।   * * *

প্রেম, তুমি বহ্নি-শিখাবহ,
যদি না উদ্দীপ্ত করো সমান দুজনে,
নিভাও অথবা সর্বগ্রাসী হুতাশন
একের অন্যকে তুমি করো সমর্পণ।

মালার সঙ্গে

রোদোক্লেয়া, নিজে আমি গেঁথেছি এ মালা,
নিজহাতে বৃন্তপাকে সুন্দর কুসুম ঃ
এখানে প্রস্ফুট পদ্ম, মুদিত গোলাপ,
বিলাপী অনিল পুষ্প, মৃদু নার্সিসাস,
গাঢ় নীলারুণ ফুল।
তুমি তুলে নাও,
পরো দেহে, কিন্তু তবু হয়ো না গরবী ঃ
এই মালা অবশেষে ঝরবে, তুমিও
নিঃশেষযৌবনা হবে।



মদনের প্রতি

মদন, তোমার তীক্ষ্ণ প্রণয়বাণে
বিঁধো দুইজনে একত্রে সুগোপনে।
দেবতারা কভু করে না পক্ষপাত,
ঘুচিবে গরিমা—দেবত্ব সেই সাথ।

অজ্ঞাত ॥ প্রেমগীতি

ওঠো, উঠে পড়ো, দোহাই তোমার, যাও
এ কী ঘুম, গলা ভেঙে গেল ডেকে ডেকে
কেন দেরি করে আমার বিপদ বাধাও
সে এসে হঠাৎ দুজনকে যদি দেখে ?

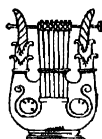
শেষকালে এই ছিল, হা আমার কপাল—
ধরা পড়ি যদি, দুজনেরই হবে খোয়ার
জানলায় দেখ আধফুটন্ত সকাল
পায়ে পড়ি, ওঠো, উঠে পড়ো, প্রিয় আমার ॥

হতাম যদি হাওয়া

তুমি বসে আছ নির্জন উপকূলে
আমি যেন এক সমুদ্রচারী হাওয়া
কেবলি তোমার বুকের আঁচল তুলে
হাতড়াই যাতে হৃদয়টা যায় পাওয়া ॥

হতাম লাল গোলাপ

আমায় তুমি তুলবে জানলে হতাম লাল গোলাপ
তোমার পাণিপ্রার্থী হতাম, জীবন-সঙ্গিনী
লজ্জা এঁকে দিত অঙ্গে আরক্তিম ছাপ
তোমার বুকে মুখ রাখতাম যখন, হে রঙ্গিনী।



লাতিন





কাইয়াস্ ভালেরিয়াস্ কাতুল্লাস্ ।। বেঁচে থেকে ভালবাসি

এসো লেস্‌বিয়া, বেঁচে থেকে ভালবাসি
হিংস্র বুড়োরা কলঙ্ক-কথা ঘুঁটে
যা বলে বলুক, কান দিও নাকো তাতে।
বারে বারে রবি ডুবে গিয়ে ফিরে আসে।
আমাদের ক্ষণ-আলো জ্বলে পুড়ে নেভে ;
তখন শুধুই আঁধার, অশেষ ঘুম্।

তাই বলি, দাও হাজার, শতেক চুমা—
আরো সহস্র, আরো শত, আরো আরো।
প্রাচুর্যে ভোলো হিসেবের আঁক কষা
একুনে তা হোক অযুত, নিযুত, কোটি।

আমাদের সেই অঙ্ক মানতো যদি
হিংসুটে লোকে হয়তো করতো ক্ষতি।

নিরুপায়

লেস্‌বিয়া তো নিত্য আমায় দিচ্ছে গালাগালি
আমার কথায় বিরতি তার নেই
আমি এখন গোল্লায় যাই,—সে যে কলাবতী
হৃদয়টি তার আমার দখলেই !

আমার পক্ষে প্রমাণটা এই, দেখছি সোজাসুজি
আমার দশাও ঠিক অবিকল তাই—
ক্ষণে-ক্ষণে মনে-প্রাণে দিচ্ছি গালাগালি,
গোল্লায় যাই, তবু তাকেই চাই।

এ-কথা কে জানতো !

আমি যে এই লেস্‌বিয়াকেই এমন ভালবাসতুম
এ-কথা কে জানতো কে-বা জানতো !
নিষ্ঠা আমার তুলনাহীন এই পৃথিবীর মধ্যে
সে-কথা কে জানতো কে-বা জানতো !

আহা রে তা টিকতো যদি ! না-ই যদি তা বাঁচে
দোষ তোমারই। আমাকে তার দোষ দেওয়া কি সাজে ?

তোমার ভালো ভাবার শক্তি ফুরোয় ঃ   খোঁজা বৃথা
কিন্তু···তুমি ছল করো···বা যা খুশি তাই করো
লেস্‌বিয়া গো, আমি তোমায় ভালবাসব তবু !

রমণী যা বলে

এমন-কি নয় দেবরাজকেও, কোনো পুরুষকে নয়,
বাসবে না ভালো—আমার রমণী বলে।
রমণী যা বলে প্রণয়ীর কানে
জলের লিখন সে তো ঃ
লিখো উত্তাল ঢেউয়ে !

ঘৃণা করি, তবু ভালবাসি

ঘৃণা করি, তবু ভালবাসি।
তুমি বলো ঃ   সেও কি সম্ভব ?
জানি না।   হৃদয়ে শুধু সেই এক যন্ত্রণার বোধ !



সাধ

জুভেন্তিয়াস্, তোমার ঠোটের মধুপান যদি ইচ্ছামাফিক পারতুম—
তাহলে তো চুমু দিতুম পাঁচশো হাজার বার !
চুম্বন-সুখ মিটতো কি তবু
আরো অসংখ্য, আরো ঘন ঘন দিতুম যদি তা
যদি নিবিড়তা—
হারিয়ে দিতো গো যবের ক্ষেত
আফ্রিকার !

হোরেস ॥ যুগ্মক

হেয় মানি পারস্যের মহা আড়ম্বর,—
পল্লবিত সোনার মুকুট ;
খুঁজিও না,—পাওয়া যায় কোথায় সুন্দর
বারো মাস গোলাপ অটুট ।
নবীন রসালো পাতে গাঁথো, সখী, মালা,
আমাদের সেই সাজে বেশ,—
বসি যবে দ্রাক্ষা-জটা—ছায়ায় নিরালা
দ্রব-চুনি সুরা করি শেষ ।

আল্‌বিয়াস্‌ তিবুল্লাস্‌ ॥ ***

আমার জন্যে একটি মেয়ের চোখের জল
পড়বে চাই না ;—বরং যাক্‌-না পান্না, সোনা।
মেসাল্লা তুমি স্থলে জলে ঘুরে ডাকাতি করো ;
একটি মোহিনী প্রণয়িনী রাখে আমাকে বেঁধে।
আমি আছি তারই দুয়ারে প্রহরী পোষা-কুকুর।
কোনো প্রশংসা চাই না, দেলিয়া, লোকের মুখে ;
'ভীরু', 'কাপুরুষ' বলুক্‌ না তারা—
আমি তো দেলিয়া, তোমারই বুকে !

যখন আমার অন্তিম ক্ষণ আসবে তখন কি হবে ধনী ?
মুমূর্ষু হাতে ধরবো তোমাকে—
যে-তুমি আমার নয়ন-মণি।



কাল রাতে

কালকে ছিল যে ব্যাকুলতা বুকে আমারই জন্যে মণি
আজ যেন কিছু কমে তা, কমতে দিও

আজকে ভাবছি যৌবনে যদি ঘটতো তেমন ত্রুটি
অনুশোচনার দায় যার আহা বেশি হত এর চেয়ে
কাল রাতে, আমি কী যে ঘটালাম—সে কী অপরাধ কোনো ঃ
প্রিয়াকে একলা ফেলে রেখে গেছি
লুকোতে ক্ষুধিত প্রাণের বাসনা-দাহ।

ভালো লাগা

কী যে ভালো লাগে তাকে বুকে নিয়ে
শোওয়া, আর
হু হু ঝড়ের শব্দ শোনা!
দক্ষিণ থেকে জোলো হাওয়া দিলে
ঝড়ের ঝাপটা এড়িয়ে তখন
নিরাপদ ঘুমে
কী সুখ, কী সুখ সে যে!

সেক্‌তাস্ প্রোপার্‌তিয়াস্ ॥ যখন ফিরিবে ঘরে

যখন ফিরিবে ঘরে ছায়াচ্ছন্ন মাটির তিমিরে
পৌঁছিবে সেখানে তুমি প্রশংসিত নতুন অতিথি
তোমারে ঘেরিয়া রবে কত শত সুন্দর আত্মারা
কমনীয় হেলেন বা আরো যারা প্রসিদ্ধ তেমন
শুনিতে আসিবে তব উদ্‌যাপিত প্রণয়-কাহিনী
তুমি যা বলিবে তাই কলকণ্ঠী, মসৃণ-ভাষিণী!

তখন বলিবে তুমি নানা প্রীতিভোজের আমোদ
মধুর যৌবন যত রচেছিল ফূর্তি ও উৎসব
বীরের প্রসিদ্ধ দ্বন্দ্ব তোমারই সৌন্দর্য পণ করি
মল্লের সংঘর্ষ যত তোমারই যা বিজয়-সম্মান!

ফুরালে সে-সব কথা বোলো তুমি বোলো তারপর
আমার নিধনে তুমি হেনেছিলে কী বা ফুলশর!



যদি তুমি হও অবিশ্বাসিনী

যদি তুমি হও অবিশ্বাসিনী,
তা বলে তোমার বসন ছিঁড়বো না কি?
রাগ-কে আমার দেবো না হানতে
তোমার বন্ধ দরজাতে ঘোর ঘাত,
বেণীর বিনুনি ছিঁড়বো না বা ও-নরম তনুকে
পাশব আঙুলে বেঁধা—
সে সমর জানি মানাতো যে কোনো গেঁয়ো মানুষকে—যার
কপালে ওঠেনি কবির মুকুট কখনো এ গৌরব।

তাই, লিখি এই একটি কথাই থাকবে যা চিরকাল ঃ
'কিন্থিয়া সে যে সুন্দরী, সে-ই কিন্থিয়া কপটিনী'।
জানি তুমি খুবই অবজ্ঞা করো লোকপ্রশংসা, তবু
বিশ্বাস করো এই কথাতেই নিভৃবে গোলাপী গাল।

পাব্লিয়াস্ ওভিদিয়াস্ নাসো ॥ শুধু অনুরোধ

তোমাকে কখনো বলিনি অন্য-প্রেমিক ডেকো না ঘরে—
কারণ তুমি যে রূপে লাবণ্যে গড়া ;
অনুরোধ শুধু ঃ তেমন দৃশ্য আমার চোখে না পড়ে—
যেন কোনোদিন এ-চোখে না পড়ে ধরা।

নীতিবাদী আমি নই যে তোমাকে এ দাবি জানাবো ভুলে ঃ
চিরকাল তুমি সতীসাবিত্রী থেকো ;
অনুরোধ শুধু ঃ যত খুশি মধু পান করো ফুলে ফুলে—
ভব্যতাটুকু কেবল বজায় রেখো।

যে-মেয়ে নিজের অপরাধ ঢাকে সহজ অস্বীকারে
পরিণামে তার আছে অবশ্য জয় ;
যে-মেয়ে কেবল ক্ষমা চেয়ে মরে গ্লানির অশ্রুধারে
অপরাধী বলে রাষ্ট্র বিশ্বময়।

পেত্রোনিয়াস্ আর্বিতার্ ॥ আমার আরাধ্য প্রেম

রাত্রির প্রথম মিঠে নৈঃশব্দের সূচনায় আমি
বিছানায় দুটি চোখ সবেমাত্র বুজেছি তখন
এল সে দুর্বার প্রেম ঝুঁটি ধরে কহিল আমাকে
(রাতের পাহারা কটু সে আমারে করেছে আদেশ)
'ওরে ক্রীতদাস তুই', বলিল সে, 'সহস্র রমণী
ভালো কি বাসিসনি রে ? তবু এই নিঃসঙ্গ শয়ন
কেমনে সম্ভব তোর, রে নিষ্ঠুর ?'—আমি তাই শুনে
যেই ধরিবারে যাই তখনি সে মিলালো শূন্যেতে !

বিস্রস্ত বসনে ছুটে নগ্নপদে মেলেনি সে পথ
এখন চলেছি ছুটে,—ক্লান্তি নামে,—এ চলায় আর
কোনো সুখ নাহি, কিন্তু ফিরে যাওয়া তারও তিক্ত স্বাদ
এবং পথের মাঝে থামা—সেও লজ্জার কারণ
মানুষের সব শব্দ, সব স্বর ডুবে থেমে যায়
সুরেলা পাখিরা থামে, আমার বিশ্বস্ত কুকুরেরা
যারা গৃহরক্ষা করে, গর্জন-মুখর যত পথ
জানি তারা থেমে গেছে, স্তব্ধ আজ, স্তব্ধ তারা সব !

সমস্ত লোকের মধ্যে একা আমি শয্যা-ঘুম-ভীত
আমার আরাধ্য প্রেম, মন মোর তারই নিয়ন্ত্রিত।

মার্কাস্ ভালেরিয়াস্ মার্তিয়ালিস্ ॥ ক্লোএ-র প্রতি

সে নীল চোখের দ্যুতি যতই রোমাঞ্চ দিয়ে যাক
তবু তা ভুলিতে পারি এমন-কি গোলাপী সে গাল
মরিব না অবশ্যই যদি তা হারিয়ে যায় ক্লোএ।

সুরম্য তুষার-গ্রীবা মুছিলেও তবু থাকে থাকা
যদিও সে গ্রীবা লাগি ব্যাকুলতা ছিল কোনোদিন
জানি সে মধুর ঠোঁটে রমণীয় চুম্বন-মাধুরী
নাও যদি মেলে আর মনে হয় থাকিতে তো পারি।

সংক্ষেপে আমার কথা, আমি আজ বাঁচার বিদ্যাতে
সত্যিই সুদক্ষ তাই মনে হয় রব অবশেষে
তুমি যদি না-ই থাকো—তোমাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে



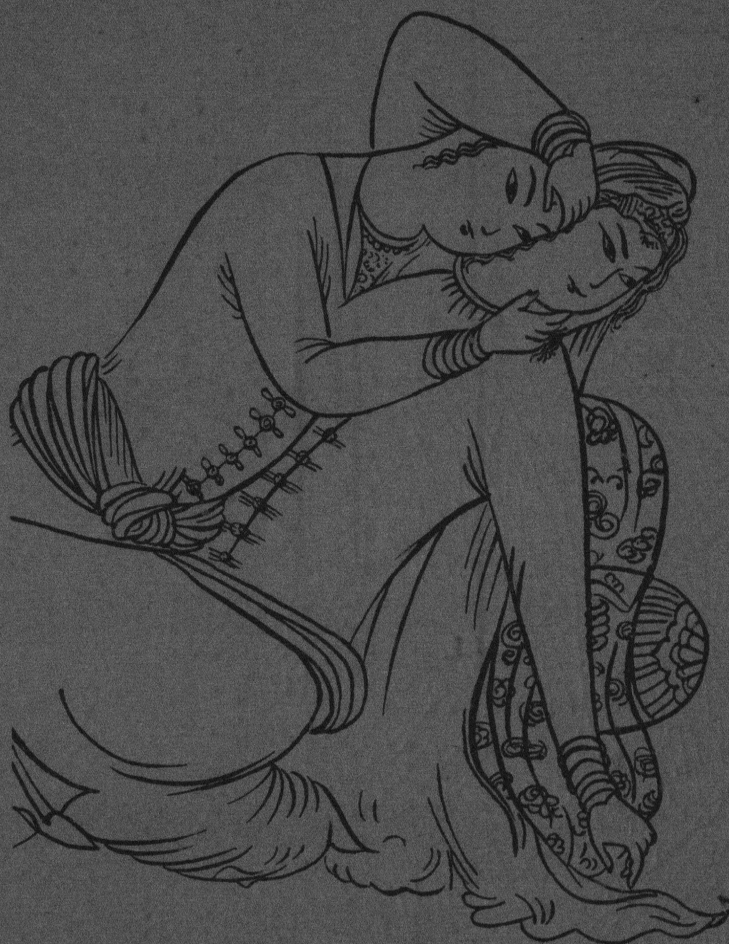
দেকিমাস্ মাগনাস্ অসোনিয়াস্ ॥ জীবন সঙ্গিনীকে

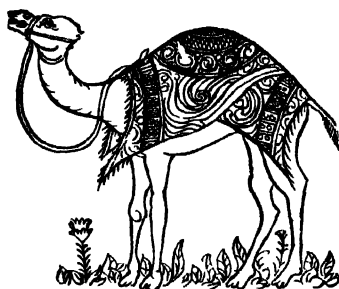
জীবনের পথ যা হয়েছে তাই থাক
দুজনকে মোরা যে-নামে ডেকেছি থাক
শোনো বধূ সেই অতীতের প্রিয় নাম
সময়ের রদ-বদলে অটুট মোরা !
আমি যে তোমার মিতা, তুমি মোর মণি।
বয়স বেড়েছে ? তাতে কি ? কিচ্ছু নয় !

আমরা তো বুড়ো হব না আজ বা পরে
শুধু সময়ের মধু নেব প্রাণভরে।



• আল্পবী





ইবন্‌ কোলথুম্‌ ।। সুরা দাও

ওঠো, তুলে ধরো ওই কারুকার্যখচিত ভৃঙ্গার,
ঢালো প্রত্যুষের, আল্‌ অন্দরের সুরা।

ঢালো আমাদের জন্য সুরা ; যার কাঞ্চন-বর্ণাভা
যেন সেই স্রোতস্বিনী, জাফরানী ফুলে যে চুমা খায়

ঢালো সুরা, যাতে ফের প্রাচীন পন্থায়
উদার, বিমুক্ত চিত্তে সুখী হতে পারি।

ঢালো সুরা, কৃপণ হৃদয়ে
যা আনে ঔদার্য, আনে সব-তুচ্ছ-করার সাহস।

দক্ষিণে উচিত ছিল যে-পানপাত্রের ঘুরে আসা,
তা থেকে আমাকে তুমি বঞ্চিত করেছ ;
অথচ ত্রয়ীর মধ্যে যাকে সুরা দিলে না, সুরার
দাবি তার সামান্য ছিল না।

বালবেকে কত না পাত্র এই আমি নিঃশেষ করেছি,
নিঃশেষ করেছি কত পাত্র আমি দামাসে, কাজরিনে।
দাও, আরো সুরা দাও! মৃত্যু তো আসবেই কোনোদিন ;
আমরা মৃত্যুরই, আর মৃত্যুও অবশ্য আমাদের।

* * *

ও-মেয়ে নির্ভয়,
ও-মেয়ে হাওয়াকে তার আলিঙ্গন হানে।
ও-মেয়ে হাওয়াকে দেয় গজদন্তধবল বুকের
সেই স্তন, যা কেউ ছোঁয়নি কোনোদিন।

ও-মেয়ে হাওয়ার হাতে তুলে দেয় দীর্ঘ, সুগঠিত
মূর্তিখানি, তুলে দেয় শ্রান্ত, গুরুভার
পৃথুল নিতম্বখানি তার।

নারীত্বের এই মুক্ত উচ্ছলতা যেন
সংকীর্ণ করেছে সব দরোজাকে, আমাকে উন্মাদ।

প্রাচীন কালের এক মর্মরের, হাতির দাঁতের
স্তম্ভ দাঁড়িয়েছে যেন ; পায়ে
সোনার শিঞ্জিনী বাজে, হাতে বাজুবন্ধের ঝংকার

ওকে ছাড়া আমি এক দলভ্রষ্ট উটেরই মতন,
রাত্রির মরুতে যার তীব্র আর্তনাদ জেগে ওঠে।
ওকে ছাড়া আমি এক হৃতবৎসা জননী যেন বা,
যে-বৃদ্ধা এখন তার দুঃখের পাথরে মাথা কোটে।



আব্দল্ সালম্ বিন্ রাগোয়ান ॥ সাকীর প্রতি

এসো সাকী! দেহ পাত্র ভরিয়া
রঙ্গিল মদিরায়;
আর কারো হাতে এমন করিয়া
পাত্র কি লওয়া যায়?
সে রস ধরে না আঙুরের ফল,—
নাহি সে মর্ত্য-লোকে,
সে যে রাঙিয়াছে তোমারি কপোল,
উজল করেছে চোখে।

আবু মহম্মদ ॥ বিদায়ক্ষণে

মাঝিরা বলিল, 'গেল বেলা গেল,
আর বিলম্ব নয়।'
সেই-ক্ষণে প্রিয়া শিখাল হিয়ায়
আঁখি কত কি যে কয়।

উদ্বেল হিয়া কাছে এল প্রিয়া
কহিতে বিদায়-বাণী ;
মনের যে কথা মুখে মিলাল তা
আধেক চেতনা মানি।

মুগ্ধ নয়ন জল-ভার-নত,
মেলি দুইখানি কর,
গোলাপের বনে মলয়ার মতো
পড়িল বুকেরি 'পর।
বাহুসম মোর উৎসুক বাহু
বেড়িয়া ধরিল তারে ;
সে কহিল কাঁদি 'পরিচয় যদি
না ঘটিত একেবারে।'

ইবন্ দারাজ্ অল্-আন্দালুসি ॥ বিচ্ছেদের ডানা

বিচ্ছেদের কালো ডানা
উড়িয়ে নিয়ে গেল আমাকে ;
খিন্ন হল চঞ্চল অশান্ত হৃদয়
আর উড়িয়ে নিল তার সমস্ত চেতনা · ·

সে যদি দেখতে পেত আমাকে,
হৃদয় যখন রাত্রিতেই পথ চলতে উদগ্রীব,
যখন আমার পদধ্বনি
মরুভূমির দৈত্যদানবের সঙ্গে আলাপচারী—
রাত্রির ছায়ায় ছায়ায়
যখন ঘুরে মরছি দগ্ধ প্রান্তরে,
সিংহের গর্জন আসছে কানে
শর-বনের আস্তানা থেকে—
যখন আকাশে জ্বলন্ত কৃত্তিকারা পাক খাচ্ছে
সবুজ বনে কালো-চোখ তরুণীদের মতো ;
আর তারাগুলো চারপাশে ঘুরছে
মদের পাত্রের মতো,
কানায় কানায় ভরে দিচ্ছে এক সুন্দরী
আর হাতে হাতে তুলে দিচ্ছে সতর্ক সেবাইত—
যখন ছায়াপথকে মনে হয়
বিষণ্ণ রাত্রির মাথায় জরাক্রান্ত সাদা চুল ;
আর আমার অভীপ্সার উত্তাপ,
আর তিমিরান্ধকারের হন্তা
—তারা উভয়েই সমান ভয়ংকর।
যখন আকাশে তারাদের চোখের পাতা
ক্লান্তিতে বুজে আসে—
আহা, তখন সে জানতে পেত
আমার আজ্ঞা বহন করেছে আমার ভাগ্য নিজেই,
আর জানতে পেত
আমি ইবন্‌ আমিরের প্রসাদের উপযুক্ত।

মু'তামিদ ॥ বাগান

ভাবনা আমার একটি সাজানো বাগান
আষাঢ়ের ধারা জানে না কখনো
তুমি যা দিয়েছ বিনে,
জানে না অন্য গোলাপের কথা
শুধু সে তোমারই নাম।
এ-বাগান আমি তোমাকে দিলাম
ফলে ফলে ভরা চৈত্‌ফসলের দিনে।

বহা উদ্‌দীন্‌ জুহাঈর ॥ একটি অন্ধ মেয়ের জন্য

ওরা বলে, আমি ভালবাসি যাকে, সে এক অন্ধ নারী।
আমি বলি, ঠিক, ভালবাসা তাই দ্বিগুণ ঢালতে পারি।
মেয়েটা অন্ধ, না-হলে আমার পাকা
চুলের কথাটা দৃষ্টিতে তাব কী করে থাকত ঢাকা।
খোলা তলোয়ার যখন আঘাত হানে,
কে তাতে অবাক মানে।
বিস্ময় মানি, যখন বারংবার
মরণান্তিক যন্ত্রণা হানে খাপে-ঢাকা তলোয়ার।
গুরুজনদের সতর্ক চোখ নেই যার কোনোখানে,
আমি ঘুরি সেই আমারই প্রেমের সুন্দর উদ্যানে।
গর্বিত লাল গোলাপের পাশাপাশি
যে জাগায় সাদা নিমীলিতাক্ষী নার্সিসাসের হাসি।

সিরাজ অল্‌-ওয়ারক ॥ মুখর ও মৌন

আকুল কূজনে কপোত কাঁদিছে
মরম যাতনা জুড়াতে তার ;
আমারি মতন ব্যথিত যে জন,
মম সম বুকে দুখেরি ভার।
সে কাকলি শোনা যায় বনে বনে,
গোপন বেদনা আমারি শুধু ;—
তবু আঁখিজল ঝরে অবিরল,
লুকানো আগুন জ্বলে সে ধূ ধূ !
হায় পাখি ; মোরা প্রেমের বেদনা
আধাআধি বেঁটে নিয়েছি দোঁহে ;
মুখর কাকলি তোমাতে কেবলি,
মৌন ব্যথা সে আমারে দহে।



'আরব্য রজনী' থেকে

*** * * ॥ এই প্রেম**

এই প্রেম, জন্ম এর আলোর জন্মের বহু আগে,
যখন থাকবে না আলো, তখনও থাকবে ভালবাসা।
কবরের উষ্ণ হাত, ওগো সেতু সত্যে পৌঁছবার,
ওগো লতা, তোমারই দাঁতের তীক্ষ্ণ ধার
ছিঁড়ে খায় মানুষের চিত্ত-বিটপীর সব আশা
এ এক আশ্চর্য অনুরাগে।

*** * * ॥ একক শয়নে**

আলো করি নিজ নিশীথ শয়ন
অকাতরে তুমি ঘুমাও যখন
আমি না দেখিতে পাই,
স্বপন হইয়া ক্ষণতরে এসে
খেলা করে যাব তব কালো কেশে,
সে আশাও মোর নাই।
তবু মনে মনে আছে বিশ্বাস,—
চিনি আমি তব পাশ-ফেরা শ্বাস
নির্ভরময় ললিতভুজের
সর্ব সমর্পণ;
যে রাত আমার হবে না প্রভাত
তুমি সে রাতেরই ধন।

* * * ॥ **নিদ্রিতা**

ওগো নিদ্রিতা, তালীবন করে স্তব্ধ তুপুব পান,
মূর্ছা-আতুর গোলাপে শুষিছে এক সোনা মৌমাছি,
নিদ্রা-আবেশে ঠোঁট তুটি হাসে। নোড়ো নাকো, আহা, নোড়ো না।

ওগো নিদ্রিতা, স্রস্ত কোবো না সোনালী চীনাংশুক
দেহের সোনার তু-ধারে ছড়ানো, ত্রস্ত হবে যে তাতে
নাচে যে-সূর্য-সোনালী-আগুন তোমাব স্ফটিক-দেহে।



নিদ্রিতা, আহা, নোড়ো না ; তোমাব ঘুমন্ত স্তনতুটি
একী উত্তাল ওঠে পড়ে যেন সমুদ্রে জাগে ঢেউ ;
তুষার তোমার তুই স্তন, পাই সাগর ফেনার ঘ্রাণ,
সাদা-লবণের স্বাদ নিই ঠোঁটে। ঢেউ ওঠে আর পড়ে।

ঢেউ ওঠে পড়ে, ওগো নিদ্রিতা। হসিত তরঙ্গিণী
রুদ্ধ-হাস্য ; পাতার আড়ালে সেই সোনা মৌমাছি
জীবন হারালো অতি প্রেম আর গোলাপী নেশার ঘোরে ;
চোখের আগুন পোড়ায় স্তনের রক্ত দ্রাক্ষা তুটি।

নিদ্রিতা, আহা, পুড়ুক, আমার হৃদয়-রক্ত-কুসুম
তোমার দেহের চন্দন আর গোলাপের রস পেয়ে
এই প্রশান্ত নির্জনতায় পাপড়ি মেলুক ধরে
আফিং ফুলের মতন — এমন শীতল স্তব্ধতাতে।

অজ্ঞাত ॥ জনশূন্য নগরী

আমার কাছে এ পৃথিবী অন্ধকার। এ আকাশ অন্ধকার।
যাকে ভালবেসেছিলাম সে কোথায়, সেই নারী
চোখ যার তারার মতো ?
জনশূন্য রাজপথ। জনশূন্য নগরী,
তলোয়ারের মুখে দখল-করা নগরী, যারা মরেছে
তারা ছাড়া কেউ নেই এখানে !

বিষণ্নমনে সকালে উঠলাম, জানালাব কপাট খুলে দিলাম,
ভেবেছিলাম আলো আসুক ঘরে, কিন্তু এল শুধু প্রেম।
ডালে ডালে পাখি জেগেছে ; কান পেতে কাকলি শুনলাম ;
এ ওর দয়িতাকে গান শোনাচ্ছে, আমিই শুধু একা।

হৃদয়কে বললাম, এই তো প্রাণের, এই তো প্রমোদের সময়,
জগতের প্রতিটি প্রাণীর মনে এখন আনন্দ, সূর্যের আলোয়
তারা জীবন্ত ;
এ ওর চোখে আলো খুঁজে পায়—সমবেদনার আলো,
এই তো করুণার মুহূর্ত, এই তো প্রেমের মুহূর্ত।

হে জনশূন্য নগরী, বলো, বলো, হে বেদনামন্থিত স্তব্ধতা
সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবেসেছিলাম যাকে
কোথায় সে নারী,
যে আমার আত্মাকে বাণী শুনিয়েছিল সে কোথায় ?
আমার কামনাতপ্ত চোখে মুগ্ধতা এনেছিল যারা,
আমাকে চুম্বন করেছিল যে ঠোঁট, আজ কোথায় ?
কোথায় সেই বুক যা নিজের বুকে ধরেছিলাম ?



ওগো আমার আত্মার আত্মীয়, উত্তর দাও, হৃদয়ে যে ক্রোধ
পুঞ্জিত হয়ে উঠছে।
বলো, সেই ধ্বংস আর মৃত্যুর দিনে কোথায় তুমি পালালে ?
দেখো, দেখো, এখনো তোমাকে ঘিরে আছে আমার দুই বাহু,
আর, এমনি করেই ঘিরে আছে সমস্ত দ্যুলোক,
দেখো, তোমাতেই আমার কামনার পরিপূর্ণতা, তাতেই
ভরে উঠছে পৃথিবী।

এমনি করেই শোকে বিলাপ করলাম। তারপর
ফিরে এলাম জানালার ধার থেকে,
এগিয়ে গেলাম সিঁড়ির দিকে, খোলা দরজা, আর
শূন্য রাজপথ ;

গভীর শোকে উচ্চকণ্ঠে কাঁদছিলাম, কেউ তো নেই আমাকে
ভর্ৎসনা করে,
আমার দুর্বলতায় উপহাস করার লোক নেই, কেউ নেই
যে আমার চোখের জল দেখবে।

অন্ধের মতো পথ হাতড়ে হাতড়ে চললাম। খুঁজে পেলাম
সেই বাড়ি, আমার প্রিয়তমার বাড়ি,
দাঁড়িয়ে গেলাম স্তব্ধ দরজার সামনে, কান পেতে শুনলাম,
ঘা দিলাম কপাটে।
চিৎকার করে বললাম, ওগো, এখনো তুমি ঘুমুবে? এখন তো
ঘুমোবার সময় নয়;
এই তো প্রেমের সময়, আমি যে প্রেম এনেছি মুঠো ভরে।

সেই বাড়ি তো আমি চিনি, কপাট বন্ধ জানালা, আব সেই
পাতাবিহীন ডুমুর গাছটা—
রাস্তার ধারে একটিমাত্র সিঁড়ি—
সিঁড়ির চারপাশ দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে উঁচুতে উঠেছে,
মনে পড়ে, ওখানেই একদিন আমার আশা
ঈপ্সিত তীর্থে পৌঁচেছিল,
শূন্য দেয়ালগুলো যাকে ঘিরে ছিল— প্রিয়তমার সেই হৃদয়কে
দুই বাহুর পাশে বেঁধে নিয়েছিল।

ওখানে সে আমার শোকে দিয়েছে সান্ত্বনা; আমি যখন বিমুখ
তখনও সে ভালবেসেছে আমাকে।
হাতে হাত রেখেছে, ঠোঁট রেখেছে আমার ঠোঁটে।
তার সমস্ত যন্ত্রণার কথা বলেছে আমাকে,

আর আমি নির্বোধের মতো ক্বচিৎ শুনেছি, ক্বচিৎ
প্রতিদান দিয়েছি চুম্বনের।

ওগো, তোমার চোখ ছিল দুটি মশাল। তাকিয়ে দেখতে গিয়ে
পালটে যেত তারা,
ওগো, তোমার ঠোঁট দুটি ছিল চুনি পান্না, তারই শিলমোহর
রইল আমার জীবনে।
ওগো, তখন যদি ভালো না বেসে থাকি, আজ তোমার
প্রতিহিংসার মুহূর্তটি তাকিয়ে দেখো ;
তোমার প্রেমের এই তো পরিণাম, আর তুমি
মুগ্ধা ছিলে আজ প্রৌঢ় পারাবতী।

কান্নায় গলা বুজে এল। চিৎকার করে ডাকলাম,
কেউ সাড়া দিল না ;
অন্ধের মতো তাকিয়ে রইল বন্ধ জানালা, বোবার মতো দরজা ;
যাকে ভালবেসেছিলাম, আমাকে ভালবেসেছিল যে নারী,
আমার আর্তিতে সে তাকিয়েও দেখল না,
হাতখানাও বাড়াল না চুম্বনের জন্যে।

তাই তো এ পৃথিবী আমার চোখে অন্ধকার। সূর্যের আলো
নিকষ কালো,
তাই চোখের জলে ঘুরে মরছি একা একা, সারাদিন সারারাত,
তাই তো স্বর্গেও আজ প্রেম খুঁজে পাই না, আলো পাই না,
রূপ পাই না,
তলোয়ারের মুখে দখল-করা এক স্বর্গ, যারা মরেছে
তারা ছাড়া কেউ নেই এখানে।

* * * ॥ প্রেম যা রাখে গোপন করে

প্রেম যা রাখে গোপন করে, আনন্দ তার সহজ প্রকাশ চায়—
কী করে বলি সে কথা, যারে লুকিয়ে রাখে প্রেম,
আসতো যদি, আমায় প্রিয়া বাঁধতো যদি নিবিড় আলিঙ্গনে
কারো লাগি যা হয়নি করা, তার লাগি করতেম।

প্রিয়ার প্রেম পেয়েছি, তারে কী করে বলো দিই যে আমি ভাষা
সকালে হল চারিটি চোখে মিলন দুজনায়,
আমায় দেখে লজ্জাবতী, আনত চোখে কাঁপলো থরো থরো—
শাসন করে দিল আবার ভুরুর ইশারায়।

"হিয়ার মাঝে দুঃখ কেন রাখিস পুষে? ওরে আমার রানি!
ভোরের তারা রাখে কি ধরে বিষাদ আঁধারের?
কী ফুল তুলে বুকের কাছে রাখিস ধরে অমন সযতনে,
লুকানো কোন্ ভাবনা মনে? পাই না আমি টের!"

বললো মেয়ে, "এ ফুল তব, নাও এ রাঙা বাঁধা-গোলাপ তোড়া,
প্রিয়, তোমারই ভাবনা নাও, চাও যদি তা পেতে।
হেলায় তারে ফেরাও যদি, তোমার চোখে দোষী যে হই পাছে
লুকিয়ে তারে রেখেছি বুকে আঁচল আড়ালেতে।"

"দোষ কী তোর? হায় রে রানি! বয়সটারই সকল অপরাধ,
বরঞ্চ দোষ ভুলে যাওয়ায়, দুঃখ-জ্বালা সওয়ায়;
ব্যথারে কেন ডরাস্ সখি, বেদনা কি-যে জানিস না তুই আজো—
দুঃখী আমি, যার বুকে প্রেম শুকায় অবহেলায়।"

আমার পানে চাইলো তুলে যুগল-ভুরু অবাক হয়ে মেয়ে—
বললো, "কাঁটা এইখানে যে রয়েছে ফুটে, আর
হৃদয়ে আমি শেখাতে নারি বইতে এই ব্যথার ভারী বোঝা,
সরাতে আর পারি না—বুকে স্তব্ধতার ভার।"

"আমারে বল্ সকল কথা, আমি তো সেই প্রবীণ চিকিৎসক ;
অনেক জ্বালা পেয়েছি, জানি এ-রোগ কিসে সারে,
দুঃখ তোরে ছোঁবে না আর ; মেলবে পাখা আনন্দে তোর মন
ভাষায় নিজ দোসর খুঁজে পাবে সে বারে বারে।"



মিষ্টি করে হাসলো প্রিয়া ; বুঝলো আমার সকল ছলনাই ;
তৃষিত এই অধরে মেলে ধরলো করতল ;
এ-যে গোলাপ পাপড়ি, তবু চুমায় ভরে দিতে সে কোমলতা
দেখি, সে রাঙা গোলাপে করে সরমে বিহ্বল।

আমার হাতে কাঁপছে হাত, খাঁচার মাঝে বন্দী ভীরু পাখি ;
"ওরে অবুঝ প্রিয়া আমার ! শেখাই তোরে কী-যে ?
সকল জ্ঞানে পরম জ্ঞান, রূপসী তুই পরম গুণবতী—
প্রেমের জাদু যে জানে, সব জেনেছে নিজে নিজে।"

আনন্দ তার কী করে বলি, কোন্ ভাষায় প্রকাশ করি তারে !
এ-কথা বলে, পথের মাঝে হাতটি ধরে তার—
আমার ঘরে এনেছি তাকে, যতনভরে শয্যা 'পরে থুয়ে,
বন্ধ করে দিয়েছি আমি সহসা দুটি দ্বার।

সহসা মুখে মিলায় হাসি, বলেছে, "না, না, হোয়ো না নিরদয় !
গলায় মিছে দিও না তুলে কলঙ্কের হার ;
আমন্ত্রণ করোনি তব জীবনে, যার জানো না পরিচয়,
মিছেই কাছে টেনে যে তার বাড়াবে ব্যথাভার।"

কী করে বলি সে কথা ! তারে প্রকাশ করি আমি সে কোন্ ভাষায়
সেই পলকে জাগলো প্রেম দোঁহার হৃদয়েই,
"প্রাণ-পোড়ানী, তুই আমার স্বর্গ", বলি, "তোরি তো নাম সুখ,
বিষাদ-কালো ধরার মাঝে সেরা যে ধন এ-ই !"

সহসা তারে ধরেছি বুকে, বেঁধেছি তারে নিবিড় আলিঙ্গনে,
বললো মেয়ে, "সত্যি যদি বাসতে মোরে ভালো !"
জবাবে তার বলেছি, "তোরে বেসেছি ভালো ওরে আমার প্রিয়া,
দরদী মোর, ঘরনী মোব, ওরে আমার আলো !"

প্রেম যা রাখে গোপন করে, আনন্দ তার সহজ প্রকাশ চায়
দিই বলে তা সবার কাছে, লুকায় যারে প্রেম।
আসতো যদি, আমায় প্রিয়া, বাঁধতো যদি নিবিড় আলিঙ্গনে—
কারো লাগি যা হয়নি করা, তার লাগি করতেম ॥



জাপানী





'মানিয়ো শু' থেকে

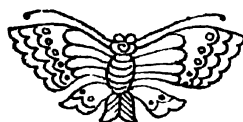
রাজকুমারী দাইহাকু ॥ * * *

হৈমন্তিক বন্ধুর ধরণী
একদিন যে শৈলসরণী
উত্তীর্ণ হয়েছি কোনোমতে,
না জানি কেমনে পার হবে
সাথে তব আমি নাই যবে
সঙ্গিনী দুরূহ দুঃখ-ব্রতে।

হিতোমারো ॥ * * *

নিগূঢ় পথের অন্বেষণে
একা ফিরি হৈমন্তিক কাননে কাননে—
যে পথ আবরে আজি
পরিকীর্ণ রক্ত আর পীত পর্ণরাজি।

তমালতালীর আড়ে অদূরে অদূরে
ফিরে অদর্শনা চির-মর্মরিত সুরে
কাঁদাইয়া মন
কাঁদাইয়া বন।



ইয়ামাবে নো আকাহিতো ॥ * * *

এক

দিগন্তে তিন-শিখরী-তেপান্তরে
পার হয়ে আসে যে প্রবাসী আজ ঘরে
তারে দিতে চাই আমার গাত্রাবাস—
দুরু দুরু বুকে থেকে থেকে জাগে ত্রাস,
পৌষের উষা, পবনে তুষার ঝরে।

দুই

প্রেম অনুভূতি
খদ্যোতের দ্যুতি
অঞ্চলের আবরণ
নহে সংবরণ।



শ্রীমতী সাকানোয়ে ॥ * * *

এক

এ প্রেমের নাই পরিচয়
এ দুঃখে বিদীর্ণ হিয়া টুটে।
আঁধার অরণ্যে ফুল
একা কেন উঠেছিল ফুটে।

দুই

ঠুন্‌কো কোরো না, কোরো না প্রণয়টিরে,
লোকমুখে মুখে ভাঙাগড়া ফিরে ফিরে—
দুঃখ দি'ও না গতিহীনা রমণীরে।

তিন

'কত অপরূপ সে যে',
একথা স্মরণ করে
হৃদয় আমার বেগবতী এক নদী,
যত বাঁধো, আর যত খুশি বাঁধ দাও
ভেঙে চুরে তবু বয়ে যাবে উদ্দাম।

ওতোমো নো ইয়াকামোচি॥ * * *

এক

গোধূলিতে খুলে রাখব ঘরের দ্বার।
স্বপনে আসবে বলেছে যে বার বার
ভুলিবে না কভু সে প্রতিশ্রুতি তার।

দুই

ছল করে আমি বলেছি তখন, 'যাব,
দেখব কেমন হাল হল সেই বাঁশের তৈরি বেড়ার।'
কিন্তু সে শুধু তোমাকে দেখারই জন্যে।

তিন

মিছে এই স্বপ্নে দেখাশোনা।
চমকিয়া জাগি
শয্যাতল খুঁজি যার লাগি
খুঁজিলেও তারে তো পাব না।

অজ্ঞাত ॥ * * *

স্রোতের জলে লেখার চেয়ে
একটামাত্র আছে বাতুলতা ;—
সেটা কেবল তারি কথাই ভাবা,—
ভাবে না যে জন্মে আমার কথা।



* * * ॥ * * *

তূর্ণ-স্রোতের আবর্ততলে বয়
গহনে গহনে শান্তি চিরস্রোতা—
আর্তপ্রহত ফেন আবর্তময়
এ প্রাণ আমার, এ প্রেমে শান্তি কোথা।

* * * ॥ * * *

গোপন গৃহের কোণে
আজ ভালবেসো না, প্রেয়সী।
চাঁদের আলোয় নলখাগড়ার বন
অকূলবিলের ধারে স্বপ্নে কথা কয়
সারারাত্রি ধরে।

* * * ॥ * * *

কি আছে এমন, প্রেয়সী, তোমার
প্রণয়ের দিব কি প্রতিদান।
প্রাণের মূল্য কি আছে? নহিলে
হাসিমুখে, সখী, দিতেম প্রাণ

* * * ॥ * * *

নববসন্ত উষ্ণশ্বাসে
নিঃশেষে যথা তুষার গলে
তোমার হৃদয় গলিয়া বহিয়া
আমাতে মিলুক প্রবল বলে

'কোকিন শু' থেকে

ওনো নো কোমাচি * * *

ত্রিভুবনে অতুল অতুল
অগোচরে ফুটে ওঠে অলক্ষ্যে যে ফুল-
আনন্দনন্দনে কোনো মন্দার সে নয়,
গোলাপকরবী নহে রাগরক্তময়
সে যে এই মানবহৃদয়।



কি নো আকিমিনে * * *

চৈত্ররথ শৈলের সানুতে
উত্তরিয়া এল বুঝি প্রিয়
অকস্মাৎ ওই শোনো কোকিলের গানে
উচ্চকিত কী নূতন সুর।

ওনো নো য়োশিকি ॥ * * *

নিরালা শৈল নিলয়ে অলক্ষিত
শিশিরসিক্ত সবুজ সতেজ তৃণে
প্রাণ অপচয় ! তেমনি অপরিচিত
প্রাণের নিভৃতে প্রেম বাড়ে দিনে দিনে

কি নো সুরাউকি * * *

পাপড়ি ঝরার ঝড় বহে, তাই হেরি,
'আহা, কী চকিতে ফুটে ঝরে যায় চেরী'—
কে যেন বলেছে ! আর এক ফুলের
ফোটা আর ঝরে যাওয়া
একটি কথায়, নাইবা বহিল হাওয়া—
শোভা সুখ আর সুরভি চকিততম—
প্রাণ জানে, প্রাণবন্ধু জানে না মম।

অজ্ঞাত ॥ * * *

নিশাশেষে উদয়ের আরক্ত আভাস
বনান্ত আকাশে।
বিলম্বকরুণ যত্ন স্রস্ত বেশভূষা
পরস্পরে খুঁজে দিতে।

* * * ॥ * * *

স্বপ্নমিলনের দুরাশাতে
সুপ্তি গেল,
রাত গেল সাথে

* * * ॥ * * *

জবুথবু জরা অদূরে আসছে দেখে
দোরে খিল এঁটে যদি বলা যেত হেঁকে
'ওরে বেয়াকুফ, গেরস্ত নাই ঘরে'—
প্রেম কাঁপিত না শঙ্কিত অন্তরে,
হরিষে বিষাদ জাগিত না থেকে থেকে।



* * * ॥ * * *

এই কী প্রকৃতি, চির রীতি, তাই
ব্যথাতুর সংসার ?
অথবা আমারই কারণে ধরেছে
বিষাদমূর্তি তার।

* * * ॥ * * *

প্রেম, তোর কে করেছে এ নামকরণ
বল্ বল্ কারে তবে কহিব 'মরণ' !

* * * ॥ * * *

শালমহুলের সুরভিশ্বাস মিশা
মনে বৃথা জাগে বিগত চৈত্রনিশা।
বার্তা শুধাই—তরুরা কেহ কি জানে
রিক্ত কাঙাল শাখায় শূন্যপানে
মূক ইঙ্গিতে কী দেখায়, কারে ডাকে
শীতার্ত চাঁদ কুহেলিতে মুখ ঢাকে।



'হিআকু-নিন্-ইস্শু' থেকে

রাজকুমারী শেঃকু ॥ * * *

জীবনের দিগন্তে আজি গো
দিনান্তে ডুবিত যদি রবি,
প্রাণে প্রাণে অঙ্গীকার
স্মৃতি বা বিস্মৃতি তার
নিঃশেষে বিলুপ্ত হত সবই।



শ্রীমতী হোরিকাওয়া ॥ * * *

তার ব্যবহার
বুঝিতে পারি না আর ;
প্রভাত বেলায়
জটা বেঁধে গেছে, হায়,
চুলে,—আর চিন্তায়।

শ্রীমতী দৈনী নো সান্মি ॥ * * *

চপল সে ঠিক
দম্‌কা হাওয়ার মত ;
জানি, তার কথা
ভুলিলেই ভালো হত ;
ব্যর্থ যতন যত।

ফুজিয়ারা নো মিচিনোবু॥ * * *

যামিনী ফুরালে
প্রভাত আসিবে, জানি ;
সূর্য জাগালে,
তবু বিরক্তি মানি ;—
তোমারে বক্ষে টানি।

ফুজিয়ারা গোকু ॥ * * *

ঝিঁ ঝি ডাকা শীত
একা জাগি বিছানায় ;
কাঁপিতেছে হৃৎ,
কাছে কেহ নাহি, হায় ;
ধরণী তুষারে ছায়।

শ্রীমতী উকন্ ॥ * * *

দুঃখে কাঁদিনে,
নিয়তির পদে নমি,
ভয় শুধু মনে
শপথ ভেঙেছ তুমি ;
দেবতা কি যাবে ক্ষমি ?

শ্রীমতী সাগামি * * *

রাগ কোরো না গো
জল দেখি নয়নেতে ; –
বঁধু গেছে মোর,
সুনাম বসেছে যেতে
মন বাঁধি কোন্ মতে।

মাতোয়াসি * * *

জোয়ার ভাটায় ভাসমান
বন্দরের বয়া যেই মতো
আমারও এ প্রাণ বন্ধু,
ওঠে পড়ে তরঙ্গে নিয়ত—
লঘু পায়ে আসো যাও যত
বিমুগ্ধনয়ন পথে
স্বপনের মতো।

সোসি ॥ * * *

হে বিহঙ্গ, উল্লসিত তব গীতরাগে
প্রাণে মোর জাগে
অহেতু বিষাদ, স্মৃতি অনির্বচনীয়,
ম্লান তারই মুখখানি যে আমার প্রিয়
আজও দেখা দেয় নাই এ আঁখির আগে

মাতস্মুও বাশো ॥ * * *

পাতায় পাতায় সব-শেষ দিনগুলি
চৈত্র লিখেছে। শুষ্ক তোমার তূলি ?
কবিতা-পত্রী ফিরে তো পায়নি কবি,
একি ভুল সখী—অথবা ভুলেছ সবই

* * * ॥ * * *

ওই কি সুদূর
পত্র পরিকীর্ণ বনে তারই পদধ্বনি ?
অদেখা বঁধুর
প্রতীক্ষায় দণ্ড পল গনি।



ফারসী





ফেরদৌসী ।। প্রথম সম্ভাষণ

এক

কতবার ভেবেছিগো, ভগবান নিজ করুণায়,
নিভৃত সৌন্দর্য তব দেখাইয়া দিবেন আমায় ;
আজিকে আপনা হতে তুমি মোরে দিলে দরশন !
অনেক দিনের সাধ—হৃদয়ের—করিলে পূরণ ।

চক্ষে দেখিতেছি তোমা, কণ্ঠস্বর শুনিতেছি কানে,
হে সুন্দরী ! কহ কথা, আরবার চাহ মোর পানে ;
মুগ্ধ শ্রবণে তুমি বলো যাহা বলিবার আছে,
অন্তরের অভিলাষ অসংকোচে কহ মোর কাছে ।

দুই

তবু

তবু মোরে হল না প্রত্যয় !
হাজারের মাঝে, ওরে !   বেছে যে নিয়েছে তোবে
আমার এ অবোধ হৃদয়।

ছিনু একা, ছিলাম স্বাধীন ;
তোমারি লাগিয়া হায়,   শিকল পরেছি পায়,
রহিব তোমারি চিরদিন।

তিন

অদৃষ্ট শাসন করে নিখিল ভুবনে,
শাসনে সে রাখে নৃপগণে ;
নারীর হৃদয়, প্রাণ, প্রেম চিরদিন
হয়ে আছে তাহারি অধীন।
রক্ত হতে পারে ক্ষয়, কি ফল তাহায় ?
অদৃষ্ট প্রেমের গতি, কে রুধিবে, হায় !

চার

বিষণ্ণ হোয়ো না সাকী হোয়ো না মলিন,
এদিন যে আনন্দের দিন ;
যুদ্ধদিনে প্রাণপণে করেছি লড়াই,
এসো, আজ জীবন জুড়াই।

আনন্দের পাত্র তুলে লও হাসিমুখে,
কাঁপে চুনি আঁখির সমুখে।
ভাবনাব বিষে মন ডুবায়ো না, হায়,
ধৌত তারে করো মদিরায়।

এক

বনের তলায় ছায়ার দোলায় ফুল-বিছানায় চল্ দুলালী,
সঙ্গে নিয়ে পাত্র-মধু, কাব্য-পুঁথি, খাদ্য-ডালি।
বিজনতায় মিষ্টি গলায় গাইবে তুমি প্রেম-রাগিণী,
বিজনতাই স্বর্গ আমার, গানের তানে ভাব্‌ব খালি। ১৩

দুই

এই দু-দিনের ছুটির দিনে বাড়িয়ে দুটি ব্যগ্র পাণি,
সঞ্চারিণী লতায় তোমার হৃদ্‌মাঝারে আন্‌বে টানি।
নয়তো কখন্ মাটি-মাতা ডাক্‌বে তোমায় বিদায়-ডাকে—
একটি শেষের আলিঙ্গনে মিলিয়ে যাবে অঙ্গখানি। ৫১



তিন

আন্ ভরে মোর প্রাণ-পিয়ালা! চোখ-চপলার পিদিম জ্বালো!
ঘ্যানঘেনিয়ে কানের কাছে বলছ কেন—"কাল ফুরালো?"
আগামী 'কাল' হয়নি হাজির, গেল-'কাল' তো মৃত্যু-নিসাড়,
'আজ'কে যখন মিষ্টি লাগে—ভূত-ভবিষ্যৎ ভাব্‌বো না লো! ৫২

চার

জ্বালাস নে আর—জ্বালাস নে আর নিয়ে তোদের স্বরগ-ধরা,
কাল যা হবে—কালকে হবে! আজকে শুধুই আমোদ-করা!
আন্ পিয়ালা! আয় না কাছে! তনু যে তোর তন্বুলতা!
আঙুল দিয়ে নাচিয়ে দেব দোতুল বেণী কুসুম-ভরা! ৫৯

পাঁচ

আমার নতুন বিয়ের খবর তোমরা বঁধু, সবাই জানো—
ফুল-বাসরে ভুল-ছোটানো হাসির বাঁশি—মন-মাতানো।
আট্কুড়ী সেই যুক্তি-বুড়ী বিছ্না থেকে নামিয়ে দিয়ে
আঙুরবালার হাত ধরে মোর নতুন করে সই-পাতানো। ৬১

ছয়

সন্ধ্যা সেদিন দিচ্ছে মুছে পৃথ্বী-সীঁথার দীপ্ত সিঁতুর,
তুয়ার-খোলা পান-আসরে মূর্তি সে এক স্বর্গ-বধূর!
কল্সি-কাঁখে এগিয়ে এসে বল্লে বালা—"তেষ্টা মেটাও,"
সোয়াদেই মন উল্সে ওঠে, ওহো, সে যে আঙুর—আঙুর! ৬৪

শেখ সা'দি ॥ প্রেমের নেশা

এক

ধন্য সে—প্রভাতে জাগি সতৃষ্ণ নয়নে
প্রতিদিন যেইজন দেখে ও বয়ান ;—
মাতাল চেতনা পায় নিশা অবসানে,
প্রেমের কাটে না নেশা না গেলে পরাণ

দুই

শেষ আশ্রয়

জাগরে সা'দি, ওঠ যদিও বিফল ব্যথায় বুক ফাটে
বুকে হেঁটেই, জখ্‌মী রে তুই ফিরবি ক্ষুরধার বাটে
হয়তো তবে মিলবে শেষে কোমল হাতের স্পর্শ তার
মরণ হবে মধুর, নিঠুর দরদিয়ার চৌকাঠে।



তিন

মেখলার মতো বাহু না জড়ালে প্রেয়সীর কটি ঘিরে
মিটবে না আশা চুম্বন দিয়ে প্রিয়ার বিম্বাধরে
জানো তারে তুমি, যার বুকে প্রেম হেনেছে কঠিন অসি ?
ছুঁতে গিয়ে ঐ প্রিয়ার গালের আপেল ওষ্ঠাধরে।

দুর্দৈবের ঢেউ ভাঙে সখি দোঁহাকার মাঝখানে
খসরু-শিরিঁর মহান প্রণয় ভাসলো সে খরবানে
বীরের যে বুক বিঁধতে পারেনি দুশমন কোনো তীরে
প্রিয়ার ভ্রূ-ধনু হতে তীর ছুটে তারেই যে দেখি হানে।

হৃদয় ভেঙেছে, চোখে ঝরে খুন, বাঁচে যদি ক্ষীণ প্রাণ
শুধু এ প্রাণের ধুক্‌ধুক্‌টুকু দিয়ে যেতে চাই তারে
আরবী ঘোড়ার খুরের তলায় ঝাপ দেব আমি, তার
অহংকারের অশ্ব-বল্গা যদি না সে টেনে ধরে।

যাহোক এমন রমণীয় রণে চাই নাকো শুধু জয়
নামটি আমার ফুটবে বারেক ব্যাকুল ওষ্ঠাধরে
একদিন এই খেলা হবে শেষ, ভাগ্যে যা থাক শেষে
প্রেমের দেউলে মরণ মধুব প্রিয়াব কুটিব-দ্বারে।

কবরের মাঝে ঘুমাব যে এই ভালবাসা বুকে বাঁধি—
একদিন সেথা জেগে উঠে আমি ঠিকানা শুধাব তাব
দুশমন হতে ত্রাণ পেতে শুনি সবে কবে অভিযোগ
বে-দরদী এক হৃদয়ের তবে নালিশ জানায় সা'দি।

মৌলবী রুমি ॥ মায়া

এক

প্রেমিক মবেছে, মবে গেছে প্রিয়া তাব
তাদের প্রেমেব চিহ্নটি নাহি আব!
ওগো ভগবান! এ কী অপরূপ মেলা!
ছায়ায় ছায়ায় ভালবাসাবাসি খেলা!
মন যাহা নহে তাই হল উন্মনা,
এ লীলা বুঝিবে বুঝাইবে কোন্ জনা!

দুই

মধুর মদির মত্ততা এসো, এসো তুমি ভালবাসা,
এসো হৃদয়ের গ্লানি-বিমোচন, সকল দর্পনাশা !
ধন্বন্তরী তুমি আমাদের, তুমিই পাতঞ্জল,
যোগের সূত্র শিখাও, করো গো নিরাময় নির্মল।

প্রেমের আবেশে পাহাড় টলেছে সাগর উঠেছে দুলে,
প্রেমের মহিমা মর্ত্য-মানুষে স্বর্গে নিয়েছে তুলে !
যদি প্রেমময় ধন্য করেন মোরে চুম্বন দানে,
উচ্ছ্বসি হিয়া কাঁদিবে কাটিয়া মুরলী-ললিত-তানে।



তিন

এই ভালবাসা, এই সেই প্রেম, স্বর্গের সুখ
মর্ত্যে পাওয়া,
ঘোমটা ঘুচানো পলকে পলকে, আলোকে পুলকে
উধাও ধাওয়া।
প্রেমের পহেলা সংসার ভোলা, প্রেমের চরম
পক্ষ মেলা,
আঁখির আড়ালে ফেলিয়া জগৎ, আকাশে বাতাসে
মত্ত খেলা !

প্রেমিকের দলে ঢুকেছ যখন, দৃষ্টি বাহিরে
দেখিতে হবে,
হৃদয়পুরীর অলিগলি যত একে একে সব
চিনিয়া লবে।
নিশ্বাস নিতে কোথায় শিখিলি, ওরে মন, তুই
নিস্ তা জেনে ;
কেন যে হৃদয় স্পন্দিত হয়—তার সমাচার
কে দেয় এনে।

চার

মৌন

বচন হারায়ে বসে আছি আমি
বন্ধ করেছি গান,
তুমি কথা কও, কথা কও, ওগো
প্রাণের প্রাণেব প্রাণ !

অতুলন যার মধুর মুখের
মদিরায় মাতোয়ারা
গান গেয়ে ওঠে অণু পরমাণু
গুঞ্জরে গ্রহতারা।

হাফিজ ॥ রুবাইয়াৎ

এক

তোমার ছবির ধ্যানে, প্রিয়,
দৃষ্টি আমার পলক-হারা।
তোমার ঘরে যাওয়ার যে-পথ
পা চলে না সে-পথ ছাড়া।
হায়, দুনিয়ায় সবার চোখে
নিদ্রা নামে দিব্য সুখে,
আমার চোখেই নেই কি গো ঘুম,
দগ্ধ হল নয়ন-তারা ॥ ১



দুই

তোমার আকুল অলক—হানে
গভীর ছায়া রবির করে।
শুক্লাচতুর্দশীর শশী
তোমার মুকুট, আঁধার হরে
ও-কস্তুরী-কালো কেশের
নিশান ওড়ায় সন্ধ্যারানী,
হেরে ও-মুখ,—উদয়-ঊষা—
পাণ্ডুর চাঁদ ডুবে মরে ॥ ৮

তিন

রক্ত-রাঙা হল হৃদয়
তোমার প্রেমের পাষাণ-ব্যথায়।
তোমার ও-রূপ জ্ঞান-অগোচর
পৌঁছে নাকো দৃষ্টি সেথায়।
জড়িয়ে গেল ভীরু হৃদয়
তোমার আকুল অলক-দামে,
সন্ধ্যা-কালো কেশে বাঁধা
দেখছি ওরে ছাড়ানো দায়॥ ১১

চার

তোমার পথে মোর চেয়ে কেউ
সর্বহারা নাইকো, প্রিয়!
তোমার চেয়ে আমার কাছে
নাই সখি, কেউ অনাত্মীয়।
তোমার বেণীর শৃঙ্খলে গো
নিত্য আমি বন্দী কেন?
মোর চেয়ে কেউ হয়নি পাগল
পিয়ে তোমার প্রেম-অমিয়॥ ১৫

পাঁচ

তোমার মুখের মিল আছে, ফুল
সাথে সে এক কমলমুখীর।
যে-ফুল হেরে দিল্ দেওয়ানা
গন্ধ যথা সদাই খুশির।

সাধ জাগে—এক ফুলদানিতে
রাখি তোরে আর তাহারে,
ফুলেল্ ঠোঁটে চুম্ব নিতে
লাগবে সুবাস পুষ্প-মদির ॥ ২৫

ছয়

বিনিদ্র কাল কাটল নিশি
একলা জেগে তোমার ব্যথায়,
অশ্রুমণির হার গেঁথেছি
নয়ন-পাতার ঝালর-সুতায়।
তোমার তরে প্রাণ পোড়ানি
কইতে নারি কারুর কাছে,
আপন মনে তাই সারাদিন
আপন ব্যথা কই আপনায় ॥ ৪৪

সাত

মোমের বাতি! পতঙ্গ এ
ভুলেও কি গো স্মরণ করো?
আমার কাছে—ভালবেসে
ভুলে যাওয়া কেমনতর!
তোমার তরে যে বেদনার
ফল্গুধারা বয় এ হৃদে,
জানে শুধু জীবন-মরুর
বালুর চর এ রৌদ্র-খর ॥ ৫০

আট

পরাণ-পিয়া !   কাটাই যদি
তোমার সাথে একটি সে রাত,
বসন সম জড়িয়ে রব
নিমেষ পলক কর্‌ব না পাত।
ভয় কি আমার, যদিই সখি
তার পরদিন মৃত্যু আসে,
পান করেছি অমর-করা
তোমার ঠোঁটের 'আব-ই-হায়াত্‌' ! ৫৫

নয়

ভালবাসার দাহন জানি, শুধিয়ো না সে কথা
শুধিয়ো না সে বিরহ-বিষ পিয়ে যে কত ব্যথা।

দুনিয়া ঘুরে, নিলাম বেছে, নিঠুরা মায়াবিনী—
হৃদয় সে-ই ভেঙেছে, শুধিয়ো না সে নামখানি

অশ্রুধারে ভিজাই আমি চরণ দুটি তার
এমন করে, শুনতে তুমি চেয়ো না বারবার।

কালকে রাতে এমন বাণী, শুনেছি কথা রাখো
মোহিনী সেই অধর হতে, শুনতে চেয়ে নাকো।

ওষ্ঠ চাপি দন্তে মোরে ভ্রূকুটি করো কেন,
প্রবাল-ঠোঁট চুমেছি কার শুধিয়ো নাকো যেন

তোমার থেকে গিয়েছি দূরে সয়েছি কত জ্বালা
শুধিয়ো নাকো, যে আছো মোর কুটির করে আলা

ভালবাসার কত যে সুখ হাফিজ জানে, ওরে !
দোহাই তার অর্থ শুধু শুধিয়ো নাকো মোরে।



দশ

রঙীন গোলাপ হারায় মাধুরী-কণা
তুমি তারে চেয়ে না দেখলে আন্‌মনা,
শিরাজী না যদি ভিজায় কণ্ঠতল
বসন্ত, আহা, বসন্ত নিষ্ফল।

তোমার গালের কুঁড়ি না করলে আলো
বাগিচার মৃদু সমীর লাগে না ভালো।

গোলাপী অঙ্গ—বাহু না জড়ালে মোর,
আঁখি হতে মোছে আধেক নেশার ঘোর

বিম্বাধরের মধু নাহি ক্ষরে যায়
আমি না চুমুক দিলে সেই পেয়ালায়।

পশ্চিমা বায়ে বৃথাই যে দোলে লতা
বুলবুল যদি না শোনায় কথকতা।

কল্পনা বসে কাটে যত আঁকিবুঁকি
তার ছবি বিনা আর সবই ঝুটা মেকী।

শিরাজী অমৃত, বাগিচার শ্যামশোভা
বঁধু বিনা তবু লাগে কিরে মনোলোভা

পাপী তোর মন, ওরে ও হাফিজ কবি
আঁকিস না সেথা প্রিয়ার মুখচ্ছবি।



মৌলানা জামি ।। পূর্ণমিলন

এক

চেয়ে থাকো, চেয়ে থাকো ; চেয়ে চেয়ে চেয়ে—
যার পানে চেয়ে আছ—তারি রূপ ছেয়ে
যাক তনু মন প্রাণ ; হও তন্ময়,—
'তোমার্' 'আমার' ভেদ হয়ে যাক ক্ষয় ;—
'চাওয়া' হয়ে যাক 'হওয়া'। নিস্পন্দ নির্বাক্,
ক্ষীরে নীরে মিলে মিলে এক হয়ে যাক্।
যে অবধি 'দুই' আছে, হায় ততক্ষণ
রয়েছে বিচ্ছেদ ভয়, রয়েছে ক্রন্দন।
পরম প্রেমের পুরে যেই পশিয়াছে,
সে জানে একের ঠাঁই সেথা শুধু আছে ;
দুই মিলে এক হলে তবে সে মিলন
সম্পূর্ণ সুন্দর হয় ;—সার্থক জীবন।



দুই

কাছে কাছে শুধু রহিব তোমার এই শুধু মোর সাধ,
তোমার নিকটে বসিতে পাইব,—এই মহা আহ্লাদ !
সারা দিনমান নয়ন ভরিয়া রহিবে মূরতি তব,
নিশার আঁধারে চরণ দুখানি মাথায় তুলিয়া লব।
গহন ছায়ায় শয়ন বিছায়ে, ও রাঙা অধর হতে
মুহু মুহু মধু পান করিব হে ভাসিব সুধার স্রোতে !
বিক্ষত হিয়া যাবে জুড়াইয়া স্নিগ্ধ প্রলেপে ভিজে,
এর বেশি সুখ চাহি না গো আমি ভাবিতে পারি না নিজে।
ঊষর এ মোর মন-মরুভূমি, তৃষায় চেতনা হারা,
নব প্রাণ দানি কবে উছলিবে তোমার স্নেহের ধারা।



পরিশিষ্ট

সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত

লোপামুদ্রা—ঋষি অগস্ত্যের পত্নী। 'আক্ষেপ' কবিতাটি ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্তের ১-২ ঋক্।

পুরুরবা-উর্বশী সংবাদ—ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত। এই সংবাদ-সূক্তটির আনুষ্ঠানিক মূল্য কি—কোনো বৈদিক ভাষ্যকারই আজ পর্যন্ত তার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। এটিকে লোককাব্যের নিদর্শন মনে করার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে।

বশীকরণ—দুটিই অথর্ববেদের আভিচারিক মন্ত্র।

পঞ্চশিখ গন্ধর্বের গান—'দীঘনিকায়ে'র সক্ক পঞ্‌হ্ সুত্রান্তের অন্তর্গত একটি কাম-গাথা। ইন্দ্রের পার্শ্বচর পঞ্চশিখ বুদ্ধের সামনে এটি গেয়েছিল। বুদ্ধ তখন রাজগৃহের পূর্বদিকে অম্বসণ্ডা নামক ব্রাহ্মণ গ্রামের উত্তর দিকে বেদিয়ক পর্বতের ইন্দসাল গুহায় অবস্থান করছিলেন। এই গাথা কার রচনা বুদ্ধ জানতে চাইলে পঞ্চশিখ বলেছিল যে, এই গাথা তারই রচনা এবং বেলুপণ্ড বীণা বাজিয়ে এই গাথা গেয়ে সে অন্যের প্রতি আসক্তা তিম্বরুর কন্যা সূর্যবর্চসার সঙ্গে একটিবারের জন্যে মিলিত হতে পেরেছিল। গাথাটি পুরোপুরি লোক-গাথা নয়।

কালিদাস—কালিদাসের রচনায় নিজের সম্বন্ধে কোনোও স্পষ্ট উল্লেখ তো দূরের কথা, জন্মস্থান ও কাল সম্পর্কেও কোনো ইঙ্গিত নেই। তবু সমস্ত কিছু বিচার করে এই অনুমানই দৃঢ় হয় যে তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের সভাকবি ও উজ্জয়িনীর অধিবাসী ছিলেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্তই কালিদাসের কাল।

অজ-বিলাপ—রঘুবংশ মহাকাব্যের ৫৫-৬০, ৬৬-৬৮ শ্লোক।

যক্ষের উক্তি—মেঘদূত-এর উত্তর মেঘের কয়েকটি শ্লোক।

ভবভূতি— ভবভূতি তাঁর বংশপরিচয় দিয়েছেন কিন্তু কাল সম্পর্কে কিছুই বলেননি। তাঁকে ৭ম খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কিংবা ৮ম খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ফেলা চলে।

শ্রীহর্ষ— ইতিহাস বিখ্যাত হর্ষবর্ধন শীলাদিত্য। অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাট্যকার।

অমরু— অমরুর শতকগ্রন্থের রচনাকাল সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ বলে অনুমান করা হয়ে থাকে, কিন্তু আরও পূর্ববর্তী অনুমান করাতেও বাধা নেই। কিংবদন্তী অনুসারে অমরুশতক শঙ্করাচার্যের রচনা।

ভর্তৃহরি— চীনা পরিব্রাজক ই-ৎ-সিঙ্ উল্লিখিত বৈয়াকরণ ভর্তৃহরিকে শৃঙ্গার-শতক-এর রচনাকার মেনে নিলে তাঁর সময় সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি।

ধর্মকীর্তি—বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মকীর্তি ও কবি ধর্মকীর্তি যদি একই ব্যক্তি হন তাহলে আবির্ভাবকাল সপ্তম শতাব্দী।

বিজ্জকা— অথবা বিজ্জা। দণ্ডীর সমকালবর্তী না হলেও কিছু পরবর্তী। তবে ৮ম শতাব্দীর পূর্ববর্তী নন। প্রসিদ্ধ নারী-কবি। ইনি 'শ্যামা' ছিলেন।

বিকটনিতম্বা—কেউ কেউ বলেন এটি কোনো পুরুষ কবির ছদ্মনাম। ১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভোজরাজ বলেছেন, বিকটনিতম্বা 'পুনর্ভূ' ছিলেন। ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে আনন্দবর্ধন একটি বেনামী কবিতা উদ্ধৃত করেছেন যা বিকটনিতম্বার রচনা।

ভাবক দেবী—১০ম শতাব্দীর পূর্বে।

মোরিকা, মারুলা, মধুর বাণী—১৩শ শতাব্দীর পূর্বে।

শীলা ভট্টারিকা—১০ম শতাব্দীর পূর্বে। রাজশেখরের মতে ইনি বাণভট্টের সমকক্ষ ছিলেন। এঁর উদ্ধৃত কবিতাটির গৌরব অসামান্য। স্বয়ং চৈতন্যদেব এটি আস্বাদ করে ভাবাবিষ্ট হতেন।

ত্রিবিক্রম—নলচম্পূ-র কবি। ৯ম শতাব্দীর শেষ এবং ১০ম শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

নিস্পট, অমৃত, রাজহস্তী প্রভৃতি—প্রাকৃত কবি। হালের গাহা সত্তসঈ-তে এঁদের স্থান মিলেছে। কালিদাসের পূর্ববর্তী।

অবন্তিসুন্দরী—কবি রাজশেখরের পত্নী। ১০ম শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

কর্ণপূর— পরমানন্দ সেন। ১৪৪৯ শকাব্দে কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ায় জন্ম। চৈতন্যদেব কর্ণপূর উপাধি দিয়েছিলেন।

বিহ্লন— কাশ্মীরের অধিবাসী। একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত।

জয়দেব— গীতগোবিন্দ-এর কবি। 'মানভঞ্জন' 'গীতগোবিন্দ'-এর মুগ্ধ-মাধব—২-৯ শ্লোক।

মিসরীয়

মিসরীয় কোনো কবিতাতেই কবির নাম নেই। একটি কবিতায় মাত্র লিপিকারের নাম আছে।

হাথর—মিসরীয় আফ্রোদিতে, প্রেমের দেবী। ইনি হিরণ্ময়ী এবং সূর্যকন্যা।

'চার' সংখ্যক কবিতায়—ঘোড়া, ধাবন্ত বনহরিণের উপমা লক্ষণীয়। এই উপমাগুলির সঙ্গে ঋগ্বেদের পুরুরবা-উর্বশী-সংবাদ ও ওল্ড টেস্টামেণ্টের সলোমন পদাবলীর কয়েকটি উপমার আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে।

'সাত' সংখ্যক কবিতা—আরবের আতর। মূলে আছে 'পুণ্ট'। আধুনিক সুদান। প্রাচীন মিসরীয় বিশ্বাসে এখানে জীবন্ত গন্ধ-ওষধি ছিল, সেখান থেকে জনৈকা সাম্রাজ্ঞী মিসরে নিয়ে আসেন।

'আট' সংখ্যক কবিতা—শিকারী মেয়ের ফাঁদ নিছক উপমা নয়। এক শ্রেণীর মেয়েদের পাখি ধরাই জীবিকা ছিল। এই পাখি-ধরা মেয়েদের সাক্ষাৎ কবিতা, স্থাপত্য ও চিত্র—সর্বক্ষেত্রেই পাওয়া যায়।

'এগারো' সংখ্যক কবিতা—এই কবিতার কবি সম্ভবতঃ মেম্ফিসের

অধিবাসী। সেখ্‌মেত্‌, আম্নিত্‌ ও নেফের্‌-তেম্‌—মিসরীয় দেবাদিদেব, তাঁর পত্নী ও সন্তান।

'আঠারো' সংখ্যক কবিতা—বাগানের রূপক মরুচারী সমস্ত জাতির কবিতাতেই মিলবে। হিব্রু কবিতায় দ্রাক্ষাকুঞ্জ।

হিব্রু

রাজা সলোমন পদাবলী—ওল্ড টেস্টামেণ্ট-এর এই অংশটি বহু আলোচিত। ইহুদী প্রাচীনদের ধারণা ছিল এটি একটি রূপক। এর বিষয়বস্তু জিহোবা ও ইহুদী জাতির পারস্পরিক প্রেম। ভক্ত খ্রীষ্টানদের মতে যিশু ও চার্চ অথবা যিশু ও মানবাত্মার প্রেম এই রূপকের অন্তর্বস্তু। কারো কারো মতে এটি সলোমন এবং কোনো গ্রাম্যবালিকার প্রেম-কাহিনী। কেউ কেউ বলেন, নায়িকা স্বয়ং শেবা'র রানী। এটিকে লৌকিক বিবাহ মঙ্গলগীতি মনে করাই সঙ্গত। সলোমন ও তাঁর প্রণয়িনীর উল্লেখে বিবাহগীতির মধ্যে ঐতিহাসিকতা খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। আমাদের দেশের লৌকিক বিবাহগীতিতেও বর বধূকে রাজারানী, রামসীতা ইত্যাদি বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

সলোমন পদাবলী খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্তীকালের রচনা।

প্রথম অধ্যায়ঃ কেদার-জাতির শিবির—এদের তাঁবুর কাপড় কালো ছাগলের লোম দিয়ে তৈরি হত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ শারন—জোপ্পা ও সিজারিয়া প্রদেশের মধ্যবর্তী সমতলভূমি। ফুলের শোভার জন্যে বিখ্যাত।

শেয়াল ছানা—চতুর ও সতর্ক প্রেমিকের রূপক। এই রূপকটি কিছুটা পরিবর্তিত রূপে পৃথিবীর বহু সাহিত্যেই সুপরিচিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ আম্মিনাদিবের রথ—সম্ভবতঃ দিবাস্বপ্নের রূপক।

শুলেমবাসিনী—বাইবেলের বিখ্যাত রূপসী আবিশাগের জন্মস্থান শুলেম। শুলেমবাসিনী অর্থ শ্রেষ্ঠ সুন্দরী।

মহানয়িমের নাচ—অসিনৃত্য। বিয়ের আগে কনের সামনে বরের অসিনৃত্য আবশ্যিক কৃত্য ছিল।

অষ্টম অধ্যায়ের শেষ সাতটি শ্লোক অনুবাদে বাদ দেওয়া হয়েছে।

জুদা হা-লেভি—আনুমানিক ১০৮০ খ্রীষ্টাব্দে তুদেলোতে জন্ম, মৃত্যু ১১৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্যালেস্টাইনে। হিব্রু জাতীয় মহাকবি। এঁর বহু কবিতা আজও ইহুদীরা ধর্মানুষ্ঠানে গান ও পাঠ করে থাকে।

চীনা

'শি চিঙ্' চীনা কবিতার প্রাচীনতম সংকলন। কেউ কেউ বলেন, এই সংকলনের কিছু কিছু কবিতা প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ১৮শ শতাব্দীর। কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে। কনফুসিয়াস সম্প্রদায় এগুলি সংগ্রহ করেছিলেন।

'কোথা সে'—তুললো দ'না পৃঃ ১১৭। চীনা শব্দটি 'আই'। আভিধানিক অর্থ 'আর্টেমিসিয়া ইণ্ডিকা'। সংস্কৃত নাগদ্রোণ, বাংলা নাগদোণা, দ্রোণ বা দ'না। চৈতন্য ভাগবতে আছে ঃ 'অপূর্ব দনার গন্ধ পায় সর্বজনে।'

সম্রাট উ তি—হানবংশের বিখ্যাত সম্রাট। ইনি সঙ্গীত আকাদেমির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হানবংশের সময় খ্রীষ্টপূর্ব ২০৬ থেকে খ্রীষ্টীয় ২২১ পর্যন্ত।

তাও য়ুয়ান্-মিঙ্—মহাকবি তাও য়ুয়ান্-মিঙ্ সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ও অসাধারণ পণ্ডিত হয়েও শ্রমসাধ্য দরিদ্র চাষীর জীবন বেছে নিয়েছিলেন। প্রকৃতি, মদ, শিশু ও ক্রিসান্থিমাম ফুল ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। চীনা মনে ক্রিসান্থিমাম ফুলের সঙ্গে তাঁর নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। জন্ম ৩৭২ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যু ৪২৭ খ্রীষ্টাব্দে।

চাঙ্ চিউ-লিঙ্—তাঙ্ যুগের প্রথম দিকের কবি। তাঙ্ যুগ ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

লি পো— অথবা লি তাই পো। আনুমানিক ৭০১ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। চীনের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি। বিচিত্র জীবন, তাও-ধর্মের প্রতি

আকর্ষণ এবং সুরাসক্তি ইত্যাদি মিলে তাঁর সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছে।

পদাবলী—বসা-কাক উড়ে যাওয়ার দিক নিয়ে চীনাদের শুভাশুভের সংস্কার আছে।

একটি বধূর কথা—রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদে এই বিখ্যাত কবিতাটির কয়েকটি লাইন পরিত্যাগ করেছেন।

নির্বাসিতের চিঠি—রাজনৈতিক কারণে লি পো য়েহ্-লাঙে নির্বাসিত হয়েছিলেন। কবিতাটি সেই সময়ে স্ত্রীর উদ্দেশে লেখা, তিনি তখন যুচাঙে।

তু ফু— জন্ম ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে। ৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লি পো-র সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই দুই সমসাময়িক মহাকবির বন্ধুত্ব আজন্ম স্থায়ী হয়েছিল। লি পো-র চেয়ে যুগ ও জীবনেব প্রতি তু ফু-র আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। তাঁর মৃত্যু হয় ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে।

জ্যোৎস্নায রাত্রি—আন্‌লুসানে বিদ্রোহেব দিনে স্ত্রীর উদ্দেশে লেখা।

পাই চু-য়ি—এই যুগেরই কবি। তাঁর কবিতায চিত্রধর্ম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

তু মু— ৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। স্টাইলের দিক থেকে তাঁর রচনা ৮ম ও ৯ম শতকের লেখকদের মধ্যবর্তী। মৃত্যু ৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে।

লি ছিঙ্‌-চাও—সুঙ্‌ যুগের কবি এবং সমগ্র চীনা সাহিত্যেব শ্রেষ্ঠ নারী কবি। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি বেশিব ভাগ কবিতা লিখেছিলেন। জন্ম আনুমানিক ১০৮১ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যু ১১৪০ খ্রীষ্টাব্দে।

ফোটা ফুল ভেসে চলে—নদীর স্রোতে ফোটা ফুল ভেসে যাওয়া প্রাচীন চীনাকাব্যের একটি সুপরিচিত রূপকল্প। এটি প্রতীকও বটে। হংসদূতের কল্পনা ভারতীয সাহিত্যের মতো চীনের সাহিত্যেও অতি প্রাচীন।

ওয়াং হো-চিঙ্‌,—য়ুয়ান যুগের নাম-করা কবি। য়ুয়ান যুগ ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

লো হেঙ্-হ্সিন, ওয়াং উ—মিঙ্ যুগের কবি। মিঙ যুগ ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

গ্রীক

সাপ্ফো—সাপ্ফোর সময় খ্রীষ্টপূর্ব ৬৩০ থেকে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। জন্ম লেস্বসে। সাপ্ফোর জীবন-কাহিনীতে ঐতিহাসিকতার চেয়ে কিংবদন্তীই বেশি। তিনি যে-সুন্দরী সহচরীদের সঙ্গে ঘুরতেন তাঁর প্রেমের কবিতার পাত্রী ছিল তাদের মধ্যে জনকয়েক তরুণী। দুর্নীতির অভিযোগে সাপ্ফোর কবিতা পরবর্তীকালে পোড়ানো হয়েছিল। সাপ্ফোর জন্মস্থান বলে লেসবস শব্দটি কাম-ব্যঞ্জনায় পরবর্তীকালে নতুন একটি শব্দ হয়ে উঠেছিল।

প্লাতোন—দার্শনিক প্লেটো। দুটি কবিতাই তাঁর নামে চলে। 'আপেল' কবিতায় যে রমণীর উল্লেখ পাই, তিনি গুরু সোক্রাতেসের মুখরা, বুদ্ধিহীনা স্ত্রী হিসেবে সাধারণভাবে পরিচিত। আরকেয়ানাসা এক সুন্দরী গণিকা, জন্ম কোলোফোনে। আথেনায়েউসের মতে এই গণিকা ছিল প্লেটোর প্রণয়িনী।

আস্ক্লেপিয়াদেস্—খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীর প্রথম দিকের কবি। গ্রীক সাহিত্যে এঁকেই প্রথম সত্যিকারের প্রেমের অর্থাৎ নরনারীর কাম সম্পর্কের কবি বলা হয়।

মেলেয়াগেরোস—খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীর কবি। এঁর কবিতা প্রধানতঃ প্রেম বিষয়ক। সমকামিতা নিয়ে লেখা কবিতার সংখ্যাও কম নয়। এঁর অধিকাংশ কবিতাতেই নায়িকাদের নামোল্লেখ আছে। নামগুলি প্রকৃত না ছদ্ম, তা জানবার উপায় নেই।

ফিলোদেমস্—কিকেরো-র সমকালীন কবি। তাঁর রচনায় যৌনতা, পানাসক্তি ও কামগন্ধের প্রাবল্য খুব বেশি।

কাল্লিমাখস্—জন্ম আনুমানিক ৩১০ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি ছিলেন আলেক-জান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের পঞ্জি-কার। মৃত্যু ২৪০ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রেমিক জেযুস—কবিতাটির প্রেমপাত্র এক তরুণ। এখানে জেয়ুসের যে প্রেমিকতা কবির উদ্দিষ্ট, তা সমকামিতা। গান্নুমেদে ছিল দেবরাজ জেযুসের পানপাত্রবাহক এবং প্রেমপাত্র।

আগাথিয়াস—পেশায় আগাথিয়াস ছিলেন আইনজীবী। নিজের ও পূর্ববর্তী কবিদের কবিতার একটি সংকলনও তিনি করেছিলেন। রোদান্থে কবির প্রেমিকা।

ফিলোমেলা জিহ্বাচ্ছেদ—গ্রীক পুবাণ অনুসারে, ফিলোমেলা বড়ো বোনের স্বামী তেবেউস্ কর্তৃক ধর্ষিতা হয়। যাতে সে কাউকে কিছু না বলতে পাবে সেইজন্যে তেরেউস্ ফিলোমেলার জিব কেটে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বাখে। কিন্তু পবে বড়ো বোন জানতে পেরে দুইজনে যুক্তি করে বড়ো বোনেব একমাত্র সন্তান ইতুলোস্‌কে হত্যা করে এবং তাব মাংস রান্না করে তেরেউস্‌কে খাওযায়। ক্রুদ্ধ তেরেউস্ দুজনকে হত্যা কবতে গেলে দেবতাবা তিনজনকেই পাখিতে রূপান্তরিত কবেন। তেরেউস্ হয বাজপাখি, বড়ো বোন চাতক আব ফিলোমেলা দোযেল।

পলাস সাইলেন্‌তিয়াবিয়াস—খ্রীষ্টীয ৬ষ্ঠ শতাব্দীব বাইজান্‌টাইন বাজ-সভার কর্মচাবী ও কবি।

তান্তালস—গ্রীক পুবাণে অভিশপ্ত তান্তালস্ চিব তৃষ্ণার্ত। সামনে জল অথচ তৃষ্ণা মিটাবাব কোনো উপায় নেই।

রুফিনাস—ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগ।

লাতিন

কাতুল্লাস—শ্রেষ্ঠ লাতিন লিরিক কবি। জন্ম আনুমানিক ৮৪ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে ভেরোনায়। বোমে আসেন ৬২ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে। রোমের কুখ্যাত ক্লোদিয়াস পালচারের বোন ও মেতেল্লাসের স্ত্রী ক্লোদিয়া-র সঙ্গে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হন। এই ক্লোদিযাই কাতুল্লাসেব কাব্যের লেসবিয়া। লেসবিয়া নামেব মধ্যে কাতুল্লাসের সাপ্‌ফো প্রীতিব ইঙ্গিত স্পষ্ট।

হোরেস—কুইন্‌টাস হোরেসিয়াস্‌ ফ্লাক্‌কাস। জন্ম ৬৫ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে। ভের্গিল তাঁকে মেসাল্লার সাহিত্যচক্রে পরিচিত করেন। হোরেসের উল্লিখিত প্রেমিকাদের নাম: লালাগে, ক্লোএ, লিদিয়া। সম্ভবতঃ সব কটি নামই কাল্পনিক।

তিবুল্লাস—আনুমানিক ৫৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে জন্ম। তিনি হোরেসের বন্ধু এবং মেসাল্লার সাহিত্যচক্রের একজন প্রধান সদস্য ছিলেন। তাঁর প্রেমের কাব্যের নায়িকা দেলিয়া নামে এক নারী এবং নেমেসিস্‌ নামে এক লোভী গণিকা। দেলিয়ার আসল নাম প্লানিয়া। সে ছিল মুক্তি-পাওয়া ক্রীতদাসী।

সেক্‌স্‌তাস অরোলিয়াস প্রোপারতিয়াস্‌—জন্ম আনুমানিক ৫৪/৫০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে। প্রেমের বিষণ্নতার দিকই তাঁর কবিতায় প্রবল। তাঁর প্রণয়িনী ছিল হোস্তিযা নামে এক নারী, কিন্থিয়া তারই ছদ্মনাম।

ওভিদিয়াস্‌ পাবলিযাস্‌ নাসো—সাধারণভাবে ওভিদ নামে খ্যাত। জন্ম ৪৩ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে। ওভিদের চারিত্রিক অখ্যাতি সর্বজনবিদিত। 'প্রেমকলা' (আরস্‌ আমাতোরিয়া) রচনার জন্যে বৃদ্ধ সম্রাট অগাস্তাস তাঁকে নির্বাসিত করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, বৃদ্ধ সম্রাটের পৌত্রী কনিষ্ঠা জুলিয়ার অবৈধ প্রণযের ব্যাপারে ওভিদ্‌ জড়িত ছিলেন।

পেত্রোনিয়াস আর্‌বিতার—সম্রাট নেরোর অন্তরঙ্গদের একজন ছিলেন। পরে নেরোর অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর তিগেল্লিনাসের চক্রান্তে অভিযুক্ত হন এবং রোমান রীতিতে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন।

মারকাস্‌ ভালেরিয়াস্‌ মার্তিয়ালিস্‌—জন্ম আনুমানিক ৪০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে। কাব্যরচনাই তাঁর জীবিকা ছিল। সম্ভবতঃ লোকরঞ্জনের জন্যেই তাঁর কবিতায় এত বেশি অশ্লীলতা।

দেকিমাস্‌ মাগনাস্‌ অসোনিয়াস্‌—জন্ম আনুমানিক ৩১০ খ্রীষ্টাব্দে। সম্রাট ভালেন্তিয়ানের পুত্র গ্রাতিয়ানের শিক্ষক ছিলেন। মৃত্যু ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

আরবী

ইবন্ কোলথুম—৬ষ্ঠ শতাব্দী। বেদুইন তাঘ্‌লিব্ গোষ্ঠীর কবি। কোলথুমের মা ছিলেন বিখ্যাত কবি ও যোদ্ধা মহাল্‌হিলের কন্যা। কোলথুমের কবিতায় সুরাপ্রীতি অত্যধিক। কিংবদন্তী আছে, নির্ভেজাল সুরাপানের ফলেই নাকি কোলথুমের মৃত্যু হয়।

আব্দল সালম্ বিন রাগোয়ান্—জন্ম ৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যু ৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে।

আবু মহম্মদ—আল্ কাসিম আল্ হারারি। জন্ম ১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যু ১১২২ খ্রীষ্টাব্দে।

ইবন্ দারাজ্ অল্ আন্দালুসি—১১শ শতাব্দীর স্পেনের কবি।

মু'তামিদ—সেভিলের রাজা। স্পেনের মুসলমান রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বিদগ্ধ ও শক্তিশালী। তাঁর কবিতাগুলি অতুলনীয়। 'আরব্য-রজনী'র হারুণ অল্ রশিদের মতো তাঁর সম্পর্কেও বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। মু'তামিদ এক সুন্দরী ক্রীতদাসীকে সারাজীবন প্রবলভাবে ভালবেসেছেন। তার নাম ছিল, ই'তিমাদ্। সে সাধারণভাবে পরিচিত ছিল রুমাকিয়া নামে। মু'তামিদ শেষ-জীবনে বন্দীদশায় মরক্কোয় প্রাণ হারান।

বহা উদ্‌দীন্ জুহাঈর—১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি। মৃত্যু ১২৫৪ খ্রীষ্টাব্দে।

সিরাজ অল্ ওয়ারক—জন্ম ১২১৮ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যু ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে।

আরব্য রজনী—সংকলিত হয় ১৪শ শতাব্দীতে। অজ্ঞাত কবিতাগুলির সবকটিই ১৪শ শতাব্দীর রচনা।

জাপানী

'মানিয়ো শু' জাপানী কবিতার প্রাচীনতম সংকলন। সংকলনের সময় ৮ম শতাব্দী।

রাজকুমারী দাইহাকু—সংকলনে এঁর কয়েকটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ৭ম শতাব্দীর নারী-কবি।

কাকিনো মোতো হিতোমারো—সংকলনের শ্রেষ্ঠ কবি। আনুমানিক ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম।

ইয়ামাবে নো আকাহিতো—হিতোমারোর সমসাময়িক কবি। হিতোমারো

ও আকাহিতোই 'মানিয়ো শু'-র শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে যুগ যুগ ধরে স্বীকৃত।

শ্রীমতী সাকানোয়ে—সাকানোয়ে কোনো কৌলিক পদবী নয়, স্থানিক নাম। প্রকৃত নাম হওয়া উচিত সাকানোয়ে-র শ্রীমতী। ৮ম শতাব্দী।

ওতোমো নো ইয়াকামোচি—জন্ম আনুমানিক ৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে। রাজ-দরবারের কর্মচারী এবং তখনকার দিনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। মৃত্যু ৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে।

'কোকিন শু' সংকলিত হয় ৯ম শতাব্দীতে। এর মধ্যেও হিতোমারো ও আকাহিতোর কবিতা স্থান পেয়েছে।

ওনো নো কোমাচি—নারী কবি। জন্ম আনুমানিক ৮১০ খ্রীষ্টাব্দে। যৌবনে এঁর রূপের ও কবিতার অসাধারণ খ্যাতি ছিল। জনশ্রুতি আছে, পরবর্তী জীবনে দারিদ্র্যের পীড়নে তাঁর ভুবন-মোহিনী রূপ একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। প্রায় সত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

কি নো আকিমিনে, ওনো নো য়োশিকি—৯ম শতাব্দীর কবি।

কি নো সুরাউকি—আনুমানিক ৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। সম্রাটের আদেশে তিনি আরও অনেকের সঙ্গে মিলে 'কোকিন শু' সংকলন করেন। তিনি এই সংকলনের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন।

'হিআকু নিন্ ইসশু' সংকলিত হয় ১৪শ শতাব্দীতে। এই সংকলনে বহু নারী কবির কবিতা স্থান পেয়েছে। এঁদের মধ্যে দৈনি নো সাম্মি বিখ্যাত জাপানী উপন্যাসলেখিকা শ্রীমতী মুরাসাকির কন্যা। সাম্মির প্রকৃত নাম ফুজিয়ারা নো কাতাকো। জন্ম আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে।

মাত্সুও বাশো—সামুরাই পরিবারের সন্তান। পরবর্তী জীবনে সাধক হয়েছিলেন। বাশো শ্রেষ্ঠ হাইকু কবি। হাইকু কবিতায় সবসুদ্ধ সতেরটি অক্ষর থাকে। প্রথম লাইনে পাঁচ অক্ষর, দ্বিতীয় লাইনে সাত অক্ষর, তৃতীয় লাইনে পাঁচ অক্ষর।

ফারসী

ফেরদৌসী—আবুল কাসিম। জন্ম ৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে। ইরানের জাতীয় কবি, 'শাহনামা'-র লেখক। প্রাচীন ইরানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সব কিছু যেন ফেরদৌসী আয়ত্ত করেছিলেন। সুলতান মামুদের বিরাগভাজন হয়ে তিনি দেশত্যাগ করেন। পরে জন্মভূমি তুস্‌-এ ফিরে এসে ভগ্ন হৃদয়ে বৃদ্ধ বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

ওমর খৈয়াম—আবুল ফতে। জন্ম নিশাপুরে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক ও কবি। কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিকখ্যাতি কবিখ্যাতির আড়ালে পড়ে আছে। ফিট্‌জিরাল্ড তাঁকে পৃথিবীর সামনে পরিচিত করেছেন। তাঁর কবিতায় অন্যান্য ইরানী কবির তুলনায় রহস্যবাদ অনেক কম। অনেকের মতে ওমর খৈয়ামকে যত বড়ো কবি বলা হয়, তত বড়ো কবি তিনি নন।

শেখ সা'দি—জন্ম সিরাজে ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর 'গুলিস্তাঁ'-কে ফারসী গদ্যের রত্ন মনে করা হয়। কিন্তু গজলেই তাঁর কাব্যপ্রতিভার সমুন্নতি।

মৌলবী রুমি—জালাল্‌উদ্‌দীন। বিখ্যাত সুফি সাধক এবং মৌলবী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। কেউ কেউ তাঁর 'মস্‌নবি'-কে ফারসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করেন। জন্ম ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে কোনিয়ায়, মৃত্যু ১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দে।

হাফিজ—সামস্‌ আল্‌-দিন মুহম্মদ। জন্ম সিরাজে ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে। হাফিজের জীবনে বহুবার পৃষ্ঠপোষকের পরিবর্তন হয়েছে। গজলে হাফিজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ফারসী লিরিক সাহিত্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর কবিতা কেবল ইরানের নয়, ভারতবর্ষ ও ইওরোপের কবিদেরও প্রভাবিত করেছিল। ইওরোপের প্রভাবিত কবিদের মধ্যে গ্যেটের নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

মৌলানা জামি—বিখ্যাত সুফি সাধক ও কবি। জামিই ফারসী ক্লাসিকাল কবিদের শেষ বংশধর। জন্ম ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যু হিরাতে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে।